লোকসংস্কৃতির স্বরূপ

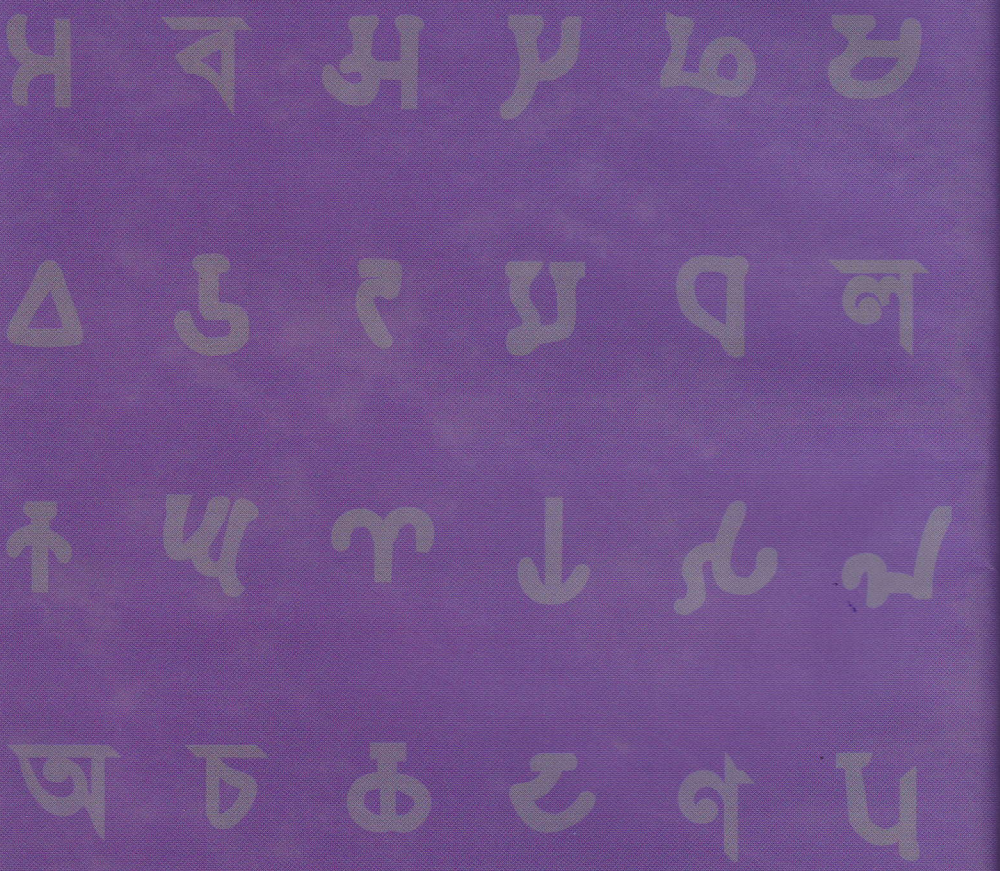

মাহমুদ শফিক

লোকসংস্কৃতির স্বরূপ

লোকসংস্কৃতির স্বরূপ

মাহমুদ শফিক

গ্রন্থাগার
সংযোজন সংখ্যা ৭৮২৩
তাং.....................
সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

প্রথম প্রকাশ ❑ জুন ২০০৬

লেখক ❑ মাহমুদ শফিক

প্রকাশক ❑ পরিচালক
মোঃ শফিক-উল-ইসলাম
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ

(স্ব) লেখক

সহকারী সম্পাদক
ড. বিশ্বনাথ সরকার, গবেষণা কর্মকর্তা
মোঃ রবিউল ইসলাম, সংরক্ষণ কর্মকর্তা

প্রচ্ছদ ❑ মোঃ মোখলেছুর রহমান

মুদ্রণ ❑ ইয়ানা এন্টারপ্রাইজ
২০৭/১ ফকিরেরপুল ১ম গলি
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

ISBN : 984-32-3366-2

মূল্য : টাকা ৭৫/- (টাকা : পঁচাত্তর মাত্র)

উৎসর্গ

অমূল্য শিল্পকর্মের কারিগর
কারুশিল্পবৃন্দকে

সূচিপত্র

সোনারগাঁও	৯
সম্প্রদায়গত পেশা	১৭
মসলিন	২৫
পুতুল নাচ	৩১
যাত্রা	৩৩
লোকবাদ্যযন্ত্র	৩৮
উপজাতীয় বাদ্যযন্ত্র	৪৩
উক্তি	৪৬
আদিবাসী জীবন	৫০
উপজাতিদের বর্ষ বিদায় এবং বর্ষ বরণ	৬৪
উপজাতীয় ভাষা	৭১
মণিপুরী নৃত্য	৭৭

সোনারগাঁও

সোনারগাঁও বাংলাদেশের একটি প্রাচীন জনপদ। মধ্যযুগে ছিল মুসলমান সুলতানদের রাজধানী। এর চারপাশ নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল বলে এলাকাটি অত্যন্ত উন্নত ছিল। এখান থেকে নৌপথে বিশ্বের যে কোনো স্থানে যাতায়াত করা যেত। এর কৌশলগত অবস্থানের কারণে মুসলমান সুলতানরা সোনারগাঁও-কে তারা অখণ্ড বাংলার রাজধানী হিসাবে গড়ে তোলেন। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সোনারগাঁও নতুন রূপ ধারণ করে। বাংলা নববর্ষের শুরুতেই সোনারগাঁও পরিধান করে সবুজ পোশাক। আমগাছে আম ধরে। লিচু গাছে লিচু ধরে। দুর্বাঘাস সবুজ হয়ে যায়। আতাগাছে হলুদ পাখি ডাকে।

সোনারগাঁয়ে রয়েছে প্রচুর নারকেল গাছ। গাছগুলো নিচু ভূমি থেকে অনেক উপরে অবস্থিত। একসময় এলাকাটি নানা লতা-গুল্ম ও বৃক্ষে আচ্ছাদিত ছিল। এখানে ছিল আকন্দ, আমলকি, কালমেঘ, মুক্তাঝুরি, বাসক, আমরুল, বনতুলসি, নিম, হরতকি, থানকুনি, ধুতরা ও অর্জুনগাছ। এসব গাছ ও লতা-গুল্ম বনৌষধি হিসাবে ব্যবহৃত হতো।

তন্তুজাতীয় গাছের মধ্যে ছিল পাট, শন ও শিমুল। একসময় এই অঞ্চলের উৎপাদিত হতো অত্যন্ত উন্নত মানের কার্পাস তুলো। এর আঁশ ছিল সূক্ষ্ম। তা থেকে উৎপন্ন হতো মসলিন তৈরির জন্য অতি সূক্ষ্ম সুতো। এই সুতো এত সূক্ষ্ম ছিল যে, এর উপর শিশির পড়লে ছিঁড়ে যেত। এই সুতো দিয়ে বোনা হতো মসলিন।

সোনারগাঁয়ের পথে প্রান্তরে ছড়িয়ে রয়েছে মুসলমান শাসকদের ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন। ইলিয়াস শাহী বংশের সবচেয়ে প্রতাপশালী সুলতান ছিলেন গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ। তার সমাধি সৌধ রয়েছে সোনারগাঁয়ের শাহাচিল্লাপুর গ্রামে। ১৩৯৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১৪১০ খ্রিস্টাব্দে নিহত হন। পাথরে নির্মিত তার সমাধি সৌধটি মুসলিম স্থাপত্যকলার অপূর্ব নিদর্শন। ঐতিহাসিক আহমদ হাসান দানী এটিকে একটি প্রদীপের মোটিফ হিসাবে বর্ণনা করেন।

সোনারগাঁয়ে মুসলমান সুলতানদের প্রধান কীর্তি হচ্ছে গোয়ালদি মসজিদ। সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের রাজত্বকালে (১৪৯৩-১৫১৯) এটি নির্মিত হয়। এক গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদটি খুবই আকর্ষণীয়। এছাড়া সোনারগাঁয়ে রয়েছে পীর-দরবেশদের দরগাহ ও মাজার। এখানে মুসলমান সুলতানরা নির্মাণ করেন সেনানিবাস।

সোনারগাঁয়ের পূর্বে ছিল মেঘনা, দক্ষিণ-পশ্চিমে শীতলক্ষ্মা, দক্ষিণে ধলেশ্বরী এবং উত্তরে ব্রহ্মপুত্র নদী। এ কারণে নগরটি দুর্গনগর হিসাবে পরিচিত ছিল। এখানে দূর-দূরান্ত থেকে আসত বিদেশী পর্যটক ও বণিকরা। সোনারগাঁও ভ্রমণ করেন পরিব্রাজক ইবনে বতুতা, মাহুয়ান, ফাহিয়েন, রালফ ফিচ প্রমুখ। প্রাচীন ও মধ্যযুগে সোনারগাঁয়ের সৌন্দর্য পর্যটকদের আকর্ষণ করে। এর আশেপাশে হয় নৌ-যুদ্ধ। ষোড়ষ শতকে দিল্লীর সম্রাট শের শাহ সোনারগাঁয়ের সঙ্গে সিন্ধুর সংযোগ স্থাপনের জন্য নির্মাণ করেন ট্রাঙ্ক রোড। বার ভূঁইয়াদের আমলে দিল্লির সম্রাটদের তরবারী এসে থেমে যায় সোনারগাঁয়ে। এ কারণে দিল্লীর সম্রাটরা সোনারগাঁওকে করতলগত করতে পারেননি। সোনারগাঁয়ে ছিল বারভূঁইয়াদের প্রধান নেতা মসনদ-ই-আলা ঈসা খাঁর রাজধানী। সেই চিহ্ন সোনারগাঁয়ে নেই। তা হয়তো পদ্মা-মেঘনা-যমুনার গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে।

সোনারগাঁয়ের অনেক গ্রামই ছিল স্বনির্ভর। গ্রামগুলোর প্রধান কুটিরজাত পণ্য ছিল মসলিন ও জামদানি। এ ছাড়া কাঠের রঙিন ঘোড়া ও হাতি ছিল বিখ্যাত। কুটির শিল্পকে কেন্দ্র করেই সোনারগাঁও হয়ে উঠেছিল একটি কর্মমুখর অঞ্চল।

বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ গঠনে অনার্য জনগোষ্ঠীর ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। এদেশের জনগণ আর্য জনগোষ্ঠীর প্রভাব মেনে নেয়নি। ফলে এ অঞ্চল আর্যীকরণের করাল গ্রাসে পড়েনি।

এদেশের লোকসংস্কৃতির মূল উৎস হচ্ছে কৃষিভিত্তিক স্বনির্ভর গ্রামব্যবস্থা। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিসর্গ যেমন নতুন রূপ ধারণ করে, তেমনি এদেশের মানুষের জীবনধারাও বদলায়। শীতে শিশির ঝরে। কুয়াশার সাদা চাদরে ঢেকে যায় প্রকৃতি। বিস্তৃত মাঠ জুড়ে ফোটে হলুদ শর্ষে ফুল। ঘরে ঘরে ওঠে খেজুরের রস। হলুদ শর্ষের রঙ মুছে গেলে শিমুল আর পারিজাত ফুল রাঙা করে দেয় দিগন্ত। এরপর জারুল দেয় বেগুনি পোচ। আসে নববর্ষ অর্থাৎ বৈশাখ।

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ দুই মাস গ্রীষ্মকাল। শীতে গাছের পাতা ঝরে যায়। শীতের গভীর থেকে অঙ্কুরিত হয় বসন্ত। নতুন পাতার প্রস্ফুটনে মানুষের মন রঙিন হয়ে যায়। আম্র মুকুলের গন্ধে মৌ মৌ করে প্রকৃতি। গ্রীষ্মের দাবদাহে মাঠ-ঘাট ফেটে যায়। কালো মেঘে ছেয়ে যায় আকাশ। আসে বকুল ঝরার দিন। একই সঙ্গে তরমুজের ভেতরটা লাল হয়ে যায়। আম ও লিচুর মধ্যে জমতে শুরু করে মধুর রস। এরপর প্রকৃতি পরিধান করে কাশফুলের শুভ্র বসন। একইভাবে মানুষের মনের রূপান্তর ঘটে। লোকশিল্পীর মন উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। এভাবেই সোনারগাঁও একটি লোকসংস্কৃতির জনপদে পরিণত হয়। মেঘনার তীরে কাশফুল আর পালতোলা নায়ের দৃশ্য মানুষকে যেমন ভাবুক করেছে, তেমনি বৈশাখের মত্ত ঝাপটা এবং নদীর ভাঙন এই জনপদের মানুষকে সংগ্রামী করেছে। সোনারগাঁয়ের মানুষের মধ্যে রয়েছে সংগ্রাম ও সহমর্মিতার সংস্কৃতি। এখানে পরিকল্পিতভাবে নগর গড়ে ওঠেনি। সবুজের পোচ দেয়া প্রকৃতির মধ্যে গড়ে উঠেছে

পানামনগর। নগরটি পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। পরিখার মাঝখানে নির্মিত হয়েছিল লাল ইটের ইমারত। ইংরেজরা এখানে একটি আধুনিক বিল্ডিং নির্মাণ করেছিল। সেটি কোম্পানি কুঠি নামে পরিচিত ছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে পানামনগরের বাড়িগুলোর সদর দরজা ছিল রাস্তার দিকে, যা শহর এলাকার বাড়ি-ঘরের বৈশিষ্ট্য। পানামনগরে ছিল ইংরেজদের ট্রেজারি, অস্ত্রাগারসহ আরো অনেক ইমারত। চুন-সুরকির গাঁথুনি দিয়ে ইমারতগুলো অত্যন্ত নিপুণভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। সুদৃশ্য পানামনগরের স্মৃতিকে বহন করছে ইমারতগুলো।

পানামনগরে নির্মিত হয়েছিল একটি ব্রিজ, যা পানাম ব্রিজ নামে পরিচিত। দুলালপুর ও পানামের মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত একটি খালের উপর নির্মিত হয়েছে ব্রিজটি। সেতুর উপরি ভাগ কেন্দ্রস্থল থেকে ঢালু হয়ে নিচের দিকে নেমে গিয়েছে। চুন-সুরকির গাঁথুনি দিয়ে নির্মিত সেতুটির তিনটি খিলান ছিল। মাঝখানের খিলানটি ছিল অনেক বড়। মোগল আমলের স্থাপত্যকলার একটি অনুপম নিদর্শন হচ্ছে পানাম ব্রিজ।

পানামনগরের আমিনপুরে ট্রেজারার বিল্ডিংটি অবস্থিত। ইংরেজরা পানামনগরে একটি নীলকুঠি স্থাপন করেছিল। বাংলাদেশ থেকে ইংল্যান্ডে একমুঠো নীলও রক্ত রঞ্জিত না হয়ে যায়নি। নীল হচ্ছে একটি গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। তা থেকে উৎপাদিত হতো নীল রং। ইংরেজরা অন্য ফসল বাদ দিয়ে নীল চাষ করতে বাধ্য করত কৃষকদেরকে। এতে কৃষকদের ফসলের ক্ষতি হতো। আর ইংরেজ নীলকররা নীল ব্যবসা করে লাভবান হতো। ইংরেজদের এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাংলার কৃষকরা অনেক স্থানে বিদ্রোহ করে। ইংরেজ অত্যাচারের কাহিনী নিয়ে দীনবন্ধু রচনা করেন কালজয়ী নাটক 'নীল দর্পণ'। ইংরেজদের অত্যাচারের স্মৃতি নিয়ে পানামনগরে দাঁড়িয়ে আছে নীলকুঠি।

একসময় সোনারগাঁও ছিল ইসলামী শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র। এর স্বাক্ষর রয়েছে ভাগলপুর গ্রামে। সেখানে রয়েছে পাঁচপীরের দরগাহ। এই দরগাহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সপ্তদশ শতকে। জেমস ওয়াইজের বর্ণনা থেকে জানা যায়, কয়েকজন ধর্ম প্রচারকের সমাধিস্থল হচ্ছে পাঁচপীরের দরগাহ। পাঁচটি সমাধি সমান্তরালভাবে মাটি থেকে পাঁচ ফুট উঁচু করে নির্মাণ করা হয়েছে। সেখানে এক সময় ছিল পাঁচ পীরদের মাথা বরাবর বাংলার কুঁড়েঘর আকৃতির চেরাগদানী। পাঁচপীর মধ্যপ্রাচ্য থেকে ইসলাম প্রচারের জন্য সোনারগাঁয়ে আসেন বলে কথিত রয়েছে। পাঁচপীরের দরগাহ হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের জন্য ভক্তি প্রদর্শনের স্থান ছিল। অনেক নাবিক এবং নৌকার মাঝি দরগাহে দোয়া নিতে আসতেন। পাঁচপীরের দরগাহ হচ্ছে সোনারগাঁয়ের গৌরবময় যুগের স্থাপত্য শিল্পের একটি অপূর্ব নিদর্শন।

সোনারগাঁয়ে সুফীসাধক শেখ মুহাম্মদ ইউসুফের সমাধি রয়েছে। তিনি পারস্য থেকে সোনারগাঁয়ে আসেন বলে ধারণা করা হয়। তার সমাধিটি বাংলার চৌচালা

কুঁড়েঘরের আদলে নির্মিত হয়েছে। শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামার মাজার রয়েছে সোনারগাঁয়ে। মুসলমান মনিষীদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন অনন্য ব্যক্তিত্ব। দিল্লির সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের রাজত্বকালে তিনি দিল্লীতে পৌঁছেন এবং ১২৭৪ খ্রিস্টাব্দে সোনারগাঁয়ে আগমন করেন। এখানে তিনি ইসলামী শিক্ষা দানের জন্য মাদ্রাসা ও খানকা প্রতিষ্ঠা করেন। তাকে বলা হয় বাংলাদেশের ইসলামী শিক্ষার অন্যতম পথিকৃৎ। সম্ভবত তার মাজার সোনারগাঁয়ের মোগরাপাড়ায় অবস্থিত। সোনারগাঁয়ে আরো রয়েছে কদমরসুল দরগাহ।

সোনারগাঁয়ের কাছেই রয়েছে লাঙ্গলবন্দ। এটি হিন্দু ধর্মালম্বীদের তীর্থ স্থান। প্রতি বছর চৈত্র মাসের অষ্টম তিথিতে দেশ-বিদেশ থেকে আগত হাজার হাজার হিন্দু ধর্মাবলম্বী ভক্ত ব্রহ্মার পদতলে আশ্রয় নেন এবং পাপমোচনের জন্য ব্রহ্মপুত্র নদে পূণ্য স্নান করেন। সেই উপলক্ষে সেখানে মেলা বসে।

সোনারগাঁও উপজেলার বারদী গ্রামে রয়েছে শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারীর আশ্রম। তার দর্শন ও শিক্ষার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে সর্বভূতে ব্রহ্মা বিরাজমান। আত্মা অমর ও অবিনাশী। জীবের কল্যাণ সাধনই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ মানবধর্ম।

সোনারগাঁও থেকে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরিত হবার পর সোনারগাঁয়ের পতন শুরু হয়। তখন ইসলাম খান বেঙ্গল সুবাহর সুবাদার নিযুক্ত হন। ১৬১১ সালে তিনি ঈসা খাঁর সাম্রাজ্য দখল করেন এবং তার বিভিন্ন দুর্গ ধ্বংস করে দেন।

মোগল সুবাদার ইসলাম খানের আক্রমণের ফলে বস্ত্র উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বস্ত্রশিল্পের আসল ধ্বংস শুরু হয় ইংরেজ আমলে, যখন ইংরেজ শাসকরা এদেশের তাঁতী এবং তাঁতশিল্পকে ধ্বংস করার উদ্যোগ নেয়। কিন্তু তাদের পক্ষে সোনারগাঁয়ের জামদানি উৎপাদনের ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা সম্ভব হয়নি।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে সোনারগাঁও শুধু রাজধানীই ছিল না, দেশের প্রধান নদী বন্দরও ছিল। ইবনে বতুতা (১৩৪৫-৪৬) সোনারগাঁওকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দরনগরী হিসাবে বর্ণনা করেন। চীনের পরিব্রাজক মাহুয়ান (১৪০৬) সোনারগাঁওকে একটি বাণিজ্যিক শহর হিসাবে দেখতে পান।

মধ্যযুগে সোনারগাঁও ছিল একটি দেয়াল ঘেরা শহর। এখানে ছিল একটি সমৃদ্ধ সড়ক-জাল। এখান থেকে প্রচুর তাঁত বস্ত্র ও মসলিন ভারত, সিংহল, পেগু, মালাক্কা ও সুমাত্রাসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে রফতানি হতো। সোনারগাঁয়ের গৌরবময় দিনের অনেক কীর্তিই আজ আর অবশিষ্ট নেই। তবে জামদানির ঐতিহ্য টিকে আছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের স্মৃতিকে সামনে রেখেই সোনারগাঁয়ে নির্মাণ করা হয়েছে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য, কারুপণ্য ও লোকসংস্কৃতির নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং প্রদর্শন।

লোকশিল্প ও সংস্কৃতির মধ্যে বিধৃত হয়েছে মানবজীবনের সংগ্রাম ও সাফল্যের কাহিনী। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে গ্রিক পণ্ডিত হেরোডোটাস লোক ঐতিহ্য সম্পর্কে কৌতূহল প্রকাশ করেন। কিন্তু চিন্তার জগতে তা তেমন আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেনি। লোকশিল্প ধীরে ধীরে মানব বিশ্বকে আলোকিত করতে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে লোকশিল্পের পুনরুজ্জীবন ঘটে। লোকশিল্প হচ্ছে এক ধরনের প্রয়োগধর্মী শিল্প; কোনো একক শিল্পীর সৃষ্টি নয়। প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনে এর সৃষ্টি হয়েছে। লোকশিল্পের সঙ্গে রয়েছে মানুষের আচার-অনুষ্ঠান এবং ধর্মবিশ্বাসের সম্পর্ক।

কারুশিল্পীরা তাদের আশেপাশের উপকরণ বা হাতিয়ারের সাহায্যে লোকশিল্পের সৃষ্টি করে। লোকশিল্পীরা প্রাচীন শিল্পকে লোক সমাজের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখে। প্রাচীন কালে মানুষ ছিল প্রকৃতির রুদ্ররোষের কাছে অসহায়। মানুষের কাছে মানব শিশুর জন্মও ছিল রহস্যজনক ব্যাপার। তাই তারা সব কিছুর পেছনেই আলৌকিক শক্তির সন্ধান করেছে। পূজা করেছে প্রকৃতিকে। শিকারে যাবার আগে মানুষ শিকারীর অভিনয় করেছে। মা সন্তান চেয়ে দেবতার পূজা করেছে। দুঃসময় থেকে মুক্তি পাবার জন্য গানের অনুষ্ঠান করেছে। এ থেকেই জন্ম হয়েছে গান ও পাঁচালীর।

লোকশিল্পে একই চিত্রের পুনরাবৃত্তি ঘটে। যেমন বিভিন্ন পণ্যের গায়ে দেখা যায় একই ধরনের লতা-পাতার চিত্র কিংবা পদ্ম, চন্দ্র, সূর্য কিংবা পাখির নকশা বা আলপনা। এভাবেই কারুপণ্যের সঙ্গে শিল্পকলার সংমিশ্রণ ঘটেছে। লোকশিল্পীরা সাধারণত অনুকরণ প্রিয়। এ কারণেই বস্তুর সঠিক চিত্র অঙ্কনের প্রতি তাদের আগ্রহ বেশি। লোকশিল্পীদের মধ্যে শাপলা বা লতা-পাতা আঁকার ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট রীতি রয়েছে। সকল দেশেই লোকশিল্পের উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয় একই ধরনের উপকরণ। যেমন- মাটি, কাঠ, সুতো, কাপড়, তামা-কাঁসা-ব্রোঞ্জ, বাঁশ, বেত, পাতা ইত্যাদি। আয়ারল্যান্ডের লোক উৎসবে খড়ের তৈরি ক্রুশ ব্যবহার করে। কৃষাণ-কৃষাণীরা ফসল কাটার সময় ব্যবহার করে খড়ের তৈরি অলঙ্কার। স্পেনের বিখ্যাত লোকশিল্প হচ্ছে সূচিকর্ম খোদাই করা পুতুল। শ্রীলঙ্কার সূচিকর্মও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের নকশীকাঁথার রয়েছে বিশ্বজোড়া খ্যাতি। বিশ্বের অনেক দেশেই বয়নশিল্প ও সূচিকর্ম লোকশিল্পের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

সোনারগাঁয়ের মসলিন ছিল মোগল রাজপরিবারের ফ্যাসন। মসলিনের একটি শাখা হচ্ছে জামদানি। অভিজাত মহিলারা এখনো বিভিন্ন উৎসব ও আচার-অনুষ্ঠানে জামদানি পরিধান করেন। লোকশিল্পের মাধ্যমে একটি দেশের জনগণের জাতীয় চরিত্র ফুটে ওঠে। সুইজারল্যান্ডের মানুষ বসন্ত ও শীতকালীন উৎসবে ব্যবহার করে শিরোভূষণ ও দেহ-সজ্জার পোশাক। ইতালির কাঠশিল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে চিত্রিত শকট। কাঠের তৈরি দৈত্যের জন্য অস্ট্রিয়া বিখ্যাত। হাঙ্গেরিতে দেখা যায় নকশা করা ধাতব পুষ্পদানীর প্রাধান্য। চীন ও জাপানে রয়েছে বিচিত্র রকমের ঘুড়ি। নববর্ষের

উৎসবে চীন কাগজ ও রেশম দিয়ে তৈরি করে ড্রাগনের মূর্তি, যা বহন করতে প্রায় তিরিশ জন লোক লাগে। ইন্দোনেশিয়ায় অর্ধেক হাতি ও মাছের আকৃতিতে নির্মাণ করা হয় মাছ ধরার নৌকা।

সোনারগাঁও জাদুঘর প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলেই দেয়ালে দেয়ালে দেখা যায় গাঢ় রঙের আলপনা। আলপনার মোটিফগুলোর মধ্যে রয়েছে সোনারগাঁয়ের চিত্রিত কাঠের ঘোড়া ও হাতি, পালকি, রাজশাহীর শখের হাঁড়ি, শাড়ির পাড়ের নকশা, টেপা পুতুল, মাছ, পাখি ইত্যাদি। আলপনা হচ্ছে হিন্দু ধর্মের উৎসবের সজ্জা। একসময় পূজা-অর্চনায় ঘরের মেঝে, উঠোন ও বারান্দায় আলপনা আঁকা হতো। এরপর তা ধর্ম নিরপেক্ষ রূপ গ্রহণ করে। নববর্ষ ও একুশে ফেব্রুয়ারিতে দেয়ালে দেয়ালে এবং সড়কের উপরে আলপনা আঁকা হয় উৎসবকে রঙিন করে তোলার জন্য। সোনারগাঁও জাদুঘরে তিন সপ্তাহব্যাপী কারুশিল্প মেলা শুরু হবার মাসখানেক আগে আলপনা আঁকার ধুম পড়ে যায়।

আগের দিনে চালের গুঁড়া মিশিয়ে পিঠালি তৈরি করে আলপনা আঁকা হতো। রঙে বৈচিত্র্য আনার জন্য চালের গুঁড়ার সঙ্গে মিশানো হতো ডালের গুঁড়া, পোড়া তুষ, ইটের গুঁড়া ইত্যাদি।

আলপনা ছিল ব্রতের আনুষ্ঠানিক অলঙ্করণ। এর কেন্দ্রস্থলে ছিল পদ্ম, বৃত্তাকার শঙ্খলতা, চালতা ফুল এবং দোলানো লতার ছবি। এটা ছিল একান্তভাবেই মেয়েলী শিল্প। নকশীকাঁথার মতো অন্দর মহলের শিল্প হিসাবেই এর পরিচিতি ছিল। আধুনিককালে নারী-পুরুষের মিলিত প্রচেষ্টায় শিল্প হিসাবে আলপনা মানুষের আনন্দ-উৎসবের আবেগময় মুহূর্তকে ফুটিয়ে তোলে। সোনারগাঁও লোকশিল্প উৎসবেও এর প্রকাশ রয়েছে। এই উৎসবের মোটিফগুলো আঁকার জন্য ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক রঙ, প্লাস্টিক ইমালশন ও আইকা। প্লাস্টিক ইমালশন ব্যবহার করলে মাসের পর মাস ধরে আলপনাগুলো থেকে যায়।

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নারী ও পুরুষদের দেহে বিভিন্ন চিত্র অঙ্কিত হয়। এসব চিত্রকে বলে অঙ্গচিত্র। প্রাচীনকালেও এ ধরনের রীতি প্রচলিত ছিল। বিয়েতে হিন্দু সম্প্রদায়ের কনে পরে চন্দনের ফোঁটা। মুসলমান মেয়েদের মুখেও আঁকা হয় লতা-পাতার চিত্র। বিভিন্ন উৎসবে মুসলমান মেয়েরা হাত রাঙায় মেহেদী রঙে। বৈষ্ণব সম্প্রদায় এবং উপজাতীয়দের মধ্যে শরীরে উলকি আঁকার রীতি প্রচলিত রয়েছে। কোনো কোনো উপজাতি সূচ দিয়ে শরীর ফুটো করে আঁকে বিভিন্ন ধরনের চিত্র। এরপর ক্ষত স্থানে লাগানো হয় বিশেষ ধরনের গাছের রস। ঘা শুকিয়ে গেলে অঙ্গে ফুটে ওঠে নীল রঙের উলকি। ইন্দ্রজালে বিশ্বাস এবং সৌন্দর্যানুভূতি থেকে সৃষ্টি হয় অঙ্গচিত্র আঁকার রীতি।

নববর্ষ, ঈদ ও বিয়ের অনুষ্ঠানে অঙ্গচিত্র আঁকার ধুম পড়ে যায়। আগের দিনে মেয়েরা পায়ে লাগাতো আলতা। চোখে পরত কাজল। আলতা ও কাজল লাগানোর

রীতি উঠে গিয়েছে। এর স্থান দখল করে নিয়েছে বিভিন্ন রঙ। স্বাধীনতা দিবসের উৎসবে ছেলে-মেয়েরা তাদের চিবুকে আঁকে লাল-সবুজ পতাকা, শাপলা ফুল ও দোয়েল পাখি। আধুনিক অঙ্গচিত্রে লোকবিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দেশাত্ববোধ। এর ফলে উলকির মোটিফেও পরিবর্তন এসেছে।

সোনারগাঁও লোক ও কারুশিল্প মেলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জীবন্ত প্রদর্শনী। জীবন্ত প্রদর্শনীর অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে কারুপণ্য উৎপাদনের প্রক্রিয়া দর্শকদের সামনে উপস্থিত করা। বিশেষ করে অবলুপ্ত পণ্যগুলোর উৎপাদন প্রক্রিয়া দেখে দর্শকরা খুবই মুগ্ধ হন। এর মধ্যে শোলার কাজ অন্যতম।

শোলা হচ্ছে এক প্রকার জলজ উদ্ভিদ। এর উচ্চতা চার-পাঁচ ফুট। ব্যাস দেড়-দুই ইঞ্চি। আগে গ্রামাঞ্চলের জলাভূমিতে প্রচুর শোলা উৎপন্ন হতো। এখন তা খুব কম দেখা যায়। মালাকার সম্প্রদায়ের কারুশিল্পীরা শোলার কারুপণ্য উৎপাদন করে। এক সময় হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে শোলার মুকুট ও টায়রার ব্যাপক চাহিদা ছিল। মন্দিরের আকৃতিতে নির্মিত শোলার মুকুট পরানো হতো বর ও কনের মাথায়। সেই চল উঠে গেছে। আগের দিনে শোলার তৈরি ময়ূর, কাকাতুয়া, টিয়া, হাতি, কুমীর, ফুল, পদ্মপাতা, ফুলের ঝাড় ইত্যাদির চাহিদাও ছিল। ক্রেতার অভাবে শোলার তৈরি কারুপণ্যের চাহিদা কমে গিয়েছে। শোলার কারুপণ্য তৈরিতে ব্যবহৃত হয় 'কাইত' নামক লোহার ধারালো অস্ত্র। এটি একটি দর্শনীয় বস্তু। শোলার তৈরি মোটিফে ব্যবহৃত হয় গোলাপী, সবুজ ও লাল রং। শুকনো শোলায় রঙ লাগালে রঙের জলীয় অংশ সহজে শুকিয়ে যায়। ফলে রঙের কারুকাজ সহজেই চোখে ধরা পড়ে।

শোলাশিল্পীরা মালাকার সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। এ পেশার লোকজন খুব দরিদ্র এবং নিরক্ষর। শোলা শিল্পীরা দিন মজুরের চেয়েও কম মজুরি পায়। ফলে মালাকার সম্প্রদায়ের লোক তাদের ঐতিহ্যবাহী পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় যোগ দিয়েছে। অল্প কয়েকটি মালাকার পরিবার টিকে আছে আত্রাই, কোটচাঁদপুর প্রভৃতি স্থানে। তাদেরই কারুকর্ম দেখা যায় সোনারগাঁয়ের লোকশিল্প মেলায়।

মেলায় দেখানো হয় শতরঞ্জি বোনার কারুকীর্তি। শতরঞ্জি হচ্ছে এক ধরনের কার্পেট, যা মোটা সুতো দিয়ে বোনা হয়। এক সময় জমিদার বাড়িতে বা খাজাঞ্জিখানায় শতরঞ্জি ব্যবহৃত হতো। এর ব্যবহার প্রায় উঠে গেছে।

১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে নিসবেত নামে একজন ব্রিটিশ রংপুর জেলার কালেকটর ছিলেন। তিনি রংপুর জেলার পীরজাদা গ্রাম পরিদর্শনে যান এবং শতরঞ্জি দেখে মুগ্ধ হন। তার নামানুসারে পীরজাদা গ্রামের একটি মৌজার নাম রাখা হয় নিসবেতগঞ্জ। নিসবেতগঞ্জ থেকে শতরঞ্জি রফতানি হতো ভারত, বার্মা, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন দেশে। শতরঞ্জি তৈরির তাঁত চার হাত প্রস্থ। টান তৈরিতে ব্যবহৃত হয় দুপাশে দুটি বাঁশ।

আগে শতরঞ্জি তৈরিতে ব্যবহৃত হতো কটনের সুতো ও ভেষজ রঙ। এর স্থান দখল করেছে সিনথেটিক সুতো ও রাসায়নিক রঙ। নিসবেতগঞ্জ থেকে জীবন্ত প্রদর্শনীতে অংশ নিতে আসেন রমজান আলী এবং তার স্ত্রী রিজিয়া বেগম। তারা তিন যুগ পার করে দিয়েছেন শতরঞ্জি তৈরি করে। কিন্তু তাদের অভাব-অনটন ঘোচেনি। বৃদ্ধ বয়সেও কঠোর পরিশ্রম করে তাদেরকে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। তারাই বলেন, 'আগের মতো শতরঞ্জির চাহিদা নেই। মানুষ শতরঞ্জির পরিবর্তে ব্যবহার করে পাটের কার্পেট। পাটের কার্পেটের দামও কম।'

সম্প্রদায়গত পেশা

প্রাচীন ভারতে স্বর্ণির্ভর গ্রাম ব্যবস্থা কার্যকর ছিল। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের তেমন প্রসার ঘটেনি। কৃষকরা উদ্বৃত্ত উৎপাদনে উৎসাহী ছিল না। সামন্ত প্রথার নিয়মে বাড়তি উৎপাদনের একটি অংশ সামন্ত প্রভুদের দিতে হতো। সে সময় কোনো কেন্দ্রীয় মুদ্রা ব্যবস্থা ছিল না। এক রাজ্যের সীমারেখার বাইরে অন্য রাজ্যের মুদ্রার প্রসার ঘটেনি। ফলে উদ্বৃত্ত অর্থে প্রাসাদ বা মন্দির নির্মাণে করা হতো। সাধারণ মানুষ মন্দিরের জন্য প্রচুর অর্থ দান করত। মন্দিরকে ঘিরে তৈরি হতো ব্যাপক কর্মসংস্থানের। ভারতে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার পর প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। নতুন সমাজ ব্যবস্থার উদয় ঘটে। তের শতকে মুসলমান সমাজের দুটি বিভাগ ছিল। একটি শ্রেণী ছিল যোদ্ধা, অন্য শ্রেণীটি ছিল ধর্মপ্রচারক ও শিক্ষক। তুর্কিরা ছিল যোদ্ধা জাতি। অন্যরা ছিল অতুর্কি। সে সময়ে অভিজাত শ্রেণী বলতে তুর্কিদেরকেই বোঝানো হতো। তারা আমীর, মালিক এবং খান উপাধী ধারণ করে।

ভারতের শহর অঞ্চল ঘিরে মুসলমান সমাজের বিকাশ ঘটে। তারা ছিল পেশাগত দিক দিয়ে সেনাবাহিনীর সদস্য, প্রশাসক, বণিক, কারিগর, করণিক ইত্যাদি। কিন্তু বাংলার মুসলমান সমাজ ছিল গ্রামভিত্তিক। তাদের মধ্যে অধিকাংশ ছিল কৃষক। সে সময় সবচেয়ে উন্নত কুটির শিল্প ছিল বস্ত্রবয়ন। অন্যান্য কারুশিল্পও বেশ উন্নত ছিল। তবে এ অঞ্চলের কারুশিল্পীদের কাজ ছিল ধীর গতি সম্পন্ন। কারণ, তাদের উৎপাদনযন্ত্র ছিল অত্যন্ত সাদাসিধা। সেগুলো তারা নিজেরাই নির্মাণ করত।

মুসলমান শাসকদের সংস্পর্শে এসে হিন্দু সমাজের পরিবর্তন ঘটে। হিন্দু সমাজ মুসলিম পোশাক, আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকে। মুসলমান আমলে হিন্দু রাজারা পরিধান করতেন সুলতানদের মতো অভিজাত পোশাক। ইসলাম ধর্মের মানবিক আচরণগুলো ভক্তিবাদীরা গ্রহণ করে। মুসলমান সুফিসাধকদের আচরণের মধ্যে ছিল মানবিক আবেদন, যা দুই ধর্মের মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করে। অনেক লোকজ উৎসব একসঙ্গে পালিত হতো। এর একটি হচ্ছে সত্য পীরের পূজা। হিন্দুরাও মুসলমান পীরের দরগায় শিরনি দিত।

সুলতানি আমলে ভারতবর্ষে জাঁকজমকের সঙ্গে বিভিন্ন উৎসব পালন করা হতো। উল্লেখযোগ্য উৎসবের মধ্যে ছিল নওরোজ, শব-ই-বরাত, মহররম, ঈদ, ওরস ইত্যাদি। নওরোজ ছিল রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান। এর মাধ্যমে নতুন বছরকে বরণ করা হতো।

সুলতানি যুগে শব-ই-বরাত জনপ্রিয় উৎসবে পরিণত হয়। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা ছিল মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব। হিন্দু সম্প্রদায়ের জনপ্রিয় উৎসব ছিল বসন্ত-পঞ্চমী, হোলি, দীপাবলী ও শিবরাত্রি। দেবতাদের মধ্যে জনপ্রিয় ছিল কৃষ্ণ। হোলির সময় সবচেয়ে বেশি আনন্দ উৎসব হতো। হোলি উৎসবে মুসলমানরাও যোগ দিত।

সুলতানি আমলে ভারতে ধাতু শিল্পের বিকাশ ঘটে। এ সময় কারিগরদের দ্বারা নির্মিত ইস্পাতের তরবারি বিদেশে রফতানি হতো।

বাংলাদেশে লোকসংস্কৃতির বিকাশ ঘটে প্রাচীন উৎপাদন প্রথাকে ভিত্তি করে। এ কারণে বংলাদেশের আদিম অধিবাসীদের ধর্ম ছিল লৌকিক ধর্ম। এদেশের উর্বর ভূমি এবং সুপেয় পানিই ছিল লোকধর্মের উৎস। মানুষ বৈদিক ধর্মের কাছে আশ্রয় পায়নি। আর্যদের কাছে এদেশ পরিচিতি ছিল ম্লেচ্ছ দেশ হিসাবে। এদেশের দেবী মাটির দেহ ধারণ করেছে এবং জলে তার বিসর্জন দেয়া হয়েছে। আর্যরা মন্দির গড়েনি। প্রতিমা গড়েনি। অগ্নি পূজা করেছে। ফলে লোকধর্মের সঙ্গে আর্যধর্মের মিলন ঘটেনি। লোকধর্মের সঙ্গে মিলন ঘটেছে ইসলাম ধর্মের।

ভারতে প্রবেশ করার প্রধান দরজা ছিল দিল্লি নগর। কারণ, সেখানে মরুভূমি ও পর্বতমালা শেষ হয়ে শুরু হয়েছে শস্য শ্যামল সমভূমি। আর্যদের ইন্দ্রপ্রস্থ নগরও সেখানেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর দিল্লির উপকণ্ঠই ছিল ভারতবর্ষের প্রধান রণক্ষেত্র। কুরুক্ষেত্র ও পানিপথের অবস্থান সেখানেই।

প্রাচীনকালে বঙ্গদেশের সমাজ বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। প্রতিটি সম্প্রদায় পুরুষানুক্রমিকভাবে একটি বিশেষ পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিল। কৃষিকাজ ছাড়া অন্যান্য পেশা ছিল একেকটি জাতির একচেটিয়া সম্পত্তি। এক সম্প্রদায়ের পেশার প্রতি অন্য সম্প্রদায়ের অধিকার ছিল না। কেবল কৃষিকাজে এই ব্যবস্থা শিথিল ছিল। সম্প্রদায়গুলোর সংরক্ষিত পেশায় যাতে অবৈধ হস্তক্ষেপ না ঘটে, সেদিকে নজর রাখত গ্রাম পঞ্চায়েত। এভাবেই প্রতিযোগিতাহীন উৎপাদন ব্যবস্থার মাধ্যমে লোকসমাজ বিবর্তিত হয়েছে।

গ্রামীণ সমাজ ছিল অর্থনৈতিকভাবে নিশ্চল এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। প্রতিটি গ্রাম ছিল স্বনির্ভর। এই ব্যবস্থায় জীবনের বেশিরভাগ পণ্যের চাহিদা মেটানোর মতো অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা কার্যকর ছিল। প্রতিটি জনবসতি গড়ে উঠেছিল কৃষক, কারিগর এবং সেবক সম্প্রদায়ের লোকদের নিয়ে। তাদের মধ্যে ছিল কৃষক, তাঁতি, কামার, কুমার, ছুঁতার, চামার, ডোম, ধোপা, নাপিত, ময়রা, গন্ধবণিক ইত্যাদি সম্প্রদায়ের লোক। তাদের মধ্যে ছিল পারস্পরিক সহযোগিতা এবং নির্ভরতার সম্পর্ক। তারা নিজেদের মধ্যে পণ্য ও সেবা বিনিময় করত। কামার ও কুমার কৃষিযন্ত্রপাতি মেরামত ও তৈরির কাজ করত। এসব যন্ত্রপাতির বিনিময়ে কৃষকরা তাদেরকে কৃষি পণ্য দিত। একইভাবে নাপিত কিংবা

ধোপা তাদের সেবার বিনিময়ে ধানসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পণ্য সংগ্রহ করত। লোকসমাজে ধাতু ও লবণ ছাড়া সব কিছুই উৎপন্ন হতো।

স্বনির্ভর গ্রাম ব্যবস্থায় এক এলাকার মানুষকে অন্য এলাকায় যেতে হতো না। বাংলায় বৈদ্য ও কায়স্থরা জমির মালিকও ছিল। বৈদ্যরা ছিল চিকিৎসক। আর কায়স্থরা ছিল করণিক। তাদের অবস্থান ছিল কৃষকদের উপরে। শূদ্ররা ছিল ব্যবসায়ী। তাদের স্থান ছিল বৈদ্য ও কায়স্থদের নিচে। কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে পানচাষি এবং ফুলচাষিদের অবস্থান ছিল নিচে। পানচাষিরা বারুই এবং ফুলচাষিরা মালাকার হিসাবে পরিচিত ছিল। কারিগরদের আয় কৃষকদের চেয়ে কম ছিল। কিন্তু লোকসমাজে তাদের মর্যাদা ছিল বেশি। তাদের উচ্চ মর্যাদার কারণ, তাদের হাতে যন্ত্রপাতি ছিল। ফলে তারা ঘরে বসে কাজ করত। আর কৃষকদেরকে জমি চাষের জন্য মাঠে যেতে হতো। পারস্পরিক পদমর্যাদার দিক থেকে মিহি কাপড় বয়নকারী শিল্পীদের মর্যাদা ছিল কিছুটা উপরে। তারা সম্প্রদায়গতভাবে তন্তুবায় হিসাবে পরিচিত ছিল। যোগী এবং শুক্লিরা তাঁতি হিসাবে পরিচিত ছিল। তারা উৎপাদন করত মোটা কাপড়, কম্বল এবং ফিতে। তাদের মর্যাদা ছিল সমাজের নিচের স্তরে।

সামাজিক সম্পর্কের পারস্পরিক বিন্যাশগুলো ধর্মাচার দ্বারা নির্ধারিত ছিল। তবে শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য ব্রাহ্মণরা উচ্চ মর্যাদা পেয়েছিল। ব্রাহ্মণদের কথা বাদ দিলে বলা যায়, যাদের হাতে উন্নত প্রযুক্তি ছিল, তারাই সমাজে উচ্চতর স্থান দখল করেছিল। সম্প্রদায়গত পেশার ক্ষয় এবং কৃষিকাজের অবনতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতার সম্পর্ক-জাল ছিন্ন করে দেয়। উৎপাদন যন্ত্র অধিকতর নিপুণ হলেই যে সমাজে সম্মান বেশি ছিল, তা পুরোপুরি ঠিক নয়। স্বর্ণকার এবং ছুঁতার সম্প্রদায়ের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিগুলো উন্নত ছিল; কিন্তু তাদের মর্যাদা ছিল কায়স্থদের নিচে। সুবর্ণবণিক অর্থাৎ স্বর্ণব্যবসায়ীদের মর্যাদা ছিল স্বর্ণকারদের উপরে।

একটি জাতির অন্তর্নিহিত শক্তির উৎস হচ্ছে তার ঐতিহ্য, ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং উৎপাদন যন্ত্রের ধারাবাহিক বিকাশ। কারুশিল্পীরাই এদেশের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি নির্মাণ করেছে। তারা যেমন পারিবারিক চাহিদা মিটিয়েছে, তেমনি সৃষ্টি করেছে কালজয়ী শিল্পকর্ম। এ কারণে প্রাচীন কালে কারুশিল্পীরা পেয়েছে উচ্চ মর্যাদা। বৈদিক যুগে ঋষিরা নিজেরাই উৎসর্গ স্তম্ভ ও বেদী নির্মাণ করতেন। রামায়ণে উল্লেখ আছে রাম উদ্ধার মিছিলে অন্যান্য শিল্পীদের সঙ্গে দারুশিল্পীরাও উপস্থিত ছিলেন।

সম্রাট অশোক কাঠমিস্ত্রীদের বিশেষ মর্যাদা দিতেন। সে সময় কোনো কারিগরকে আহত করার শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। সম্রাট আকবর কারুশিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। দেশ দ্রুত নগরায়নের ফলে কারুশিল্পীদের পারিবারিক ও অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ভেঙে পড়ে। কারুপণ্যের স্থান দখল করে নেয় শিল্পপণ্য।

শিল্প বিপ্লবের আগে জাতীয় আয়ের সিংহভাগ আসত কৃষিখাত থেকে। গৃহভিত্তিক কুটির শিল্পগুলো স্থানীয় চাহিদা মিটাত। এসব পণ্য জাতীয় পর্যায়ের চাহিদা মেটাতে সক্ষম ছিল না। বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কারুপণ্যগুলোর তেমন অবদান ছিল না। মধ্যযুগের সমাজ ছিল অনেকটা নিশ্চল। মানুষের আচরণ ছিল শান্ত। তারা ছিল উৎপাদনের জোয়ার থেকে মুক্ত। যান্ত্রিক উৎপাদন প্রথা মানুষের জীবন সম্পূর্ণ পাল্টে দেয়। সামাজিক বিন্যাস সম্পূর্ণ উলট-পালট হয়ে যায়।

উৎপাদন পদ্ধতির বিপ্লব সবচেয়ে প্রথম এবং সুস্পষ্টভাবে ধরা দেয় বস্ত্রশিল্পে। গৃহভিত্তিক কারখানায় মালিকরা নিজেরাই কাজ করত। শ্রমিকদের নিজস্ব যন্ত্রপাতি থাকত। শিল্প বিপ্লবের পর থেকে কারখানার মালিকরা শ্রমিক নিয়োগ শুরু করে। এতে সমাজের বিন্যাস বদলে যেতে থাকে। উৎপাদন হারের বৃদ্ধি ঘটে। ধীরে ধীরে শ্রমের বিভাজন সৃষ্টি হয়। শ্রমিকদের মধ্যে দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

শিল্প বিপ্লবের আগে বেশিরভাগ সম্প্রদায় ছিল নিজেদের চাহিদা পূরণে ব্যস্ত। এ কারণে তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব ছিল না। শিল্প বিপ্লবের ফলে বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিযোগিতা শুরু হয়। প্রতিযোগিতাহীন গৃহভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়। ধর্মভিত্তিক চিন্তার স্থান দখল করে নেয় ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বোধ। ফলে যৌথ শিল্পের ভিত্তি ভেঙে পড়ে। লোকশিল্পের স্থান দখল করে নেয় আধুনিক চিত্রকলা।

গৌরবময় অতীতের কাহিনী তুলে আনার জন্য মানুষ তার লোকশিল্পের পুনরুজ্জীবন ঘটায়। কারণ, লোকশিল্পের মধ্যে বিধৃত রয়েছে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর জাতীয় চরিত্র। একটি গাড়ি সব দেশেই গাড়ি। তার ব্যবহার পদ্ধতিও একই রকম। একটি ঘড়ি সব দেশেই একটি ঘড়ি। কিন্তু একজন ইংরেজ কখনো একজন বাঙালির মতো নয়। তাদের গায়ের রঙ, সভ্যতা, সংস্কৃতি, চরিত্র ও ভাষা ভিন্ন। এক দেশের দারুশিল্প অন্য দেশের দারুশিল্প থেকে পৃথক। প্রতিটি জাতি লোকশিল্পের দর্পণে নিজের চেহারা দেখতে পায়।

ভারতে ইংরেজ বণিকদের অভ্যুদয় ঘটে প্রধানত তিনটি শহর-মাদ্রাজ, কলকাতা ও বোম্বাইকে কেন্দ্র করে। এই তিনটি শহরের মধ্যে মাদ্রাজে ইংরেজ প্রভাব পড়ে কম। বোম্বাইতে জাতীয় বণিকতন্ত্র ও স্বাজাত্য বোধ প্রবল ছিল। তা সত্ত্বেও সেখানে নতুন যুগের বাতাস দ্রুত লাগে। কলকাতায় ঔপনিবেশিক পুঁজি ও জীবনযাত্রার গোড়া পত্তন ঘটে দ্রুত। এর প্রভাব সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এ অঞ্চলের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শক্তি কলকাতায় কেন্দ্রীভূত হয়। এ কারণেই ভারতের মধ্যে কলকাতায় সবচেয়ে দ্রুত শিল্প বিপ্লবের প্রভাব পড়ে। বণিকতন্ত্রের জটিল প্রভাবে সমাজের গৃহশিল্প ও পল্লী সমাজ দ্রুত আক্রান্ত হয়। সমাজের মধ্যে সৃষ্টি হয় ইংরেজ শাসকদের দালাল, টাউট, সামন্ত প্রভু, জমিদার, তালুকদার ও ফড়ে শ্রেণীর লোক। সমাজের ভদ্র সমাজ নতুন মোড়ক পড়ে।

সম্প্রদায়গত পেশা

ইংরেজদের চিন্তা ও দর্শন মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর মনে নতুন সভ্যতার আলো জ্বেলে দেয়। বাঙালিরা সেই আলোয় নতুন করে নিজেদের দেশকে চেনার চেষ্টা করে। ফলে তাদের মধ্যে স্বজাত্য বোধ জাগ্রত হয়। কিন্তু বিদেশ-বাণিজ্য তাদের মনে শেকড় গাড়েনি। এ কারণেই ইংরেজ বণিকতন্ত্রের আদর্শে বাঙালি সমাজ গঠিত হয়নি। গঠিত হয় ঔপনিবেশিক ধাঁচে।

যেখানে রেল লাইন স্থাপন করা হয়, সেখানেই শিল্প বিপ্লবের প্রভাব দ্রুত পড়ে। এর প্রভাবে গৃহশিল্পগুলো চরমভাবে আঘাত প্রাপ্ত হয়। একই সঙ্গে কারুশিল্পীদের মন ও মননে পরিবর্তন ঘটে।

লোকশিল্পের স্টাইল গড়ে ওঠার পেছনে রয়েছে লোকসমাজের উদ্ভাবনী শক্তি এবং অভিজ্ঞতা। কুমার হাঁড়ির গায়ে চুন লাগিয়ে সাগুর সঙ্গে রঙ মিশিয়ে এঁকেছে লক্ষ্মীর সরা বা শখের হাঁড়ি। এই অভিজ্ঞতা একান্তভাবেই লোকসমাজের অভিজ্ঞতা। লোক কারুকৌশলগুলো সঞ্চিত সাধনার ফল। তা সঞ্চারিত হয়েছে যুগ থেকে যুগান্তরে।

সময়ের বিবর্তনে লোকশিল্পগুলো পুরোনো বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করে নতুন রূপ গ্রহণ করে। এর মূলেও রয়েছে লোকসমাজের পরিবর্তন। এ কারণেই মুসলমান শাসকদের আমলে হিন্দু দেবদেবীর পাশাপাশি লতা-পাতা ফুল-ফল, পাখি ইত্যাদি মোটিফ লোকশিল্পে স্থান করে নেয়।

গ্রামের পত্তন হয়েছে নদ-নদী, খাল-বিল ও খাটিকার তীরে। কারণ, জলাশয় ছাড়া অন্য উপায়ে পানির চাহিদা মেটানো সম্ভব ছিল না। প্রতি গ্রামে ছিল নদী-নালা-খাল-বিল ও পুকুর। গ্রামের মধ্যেই ছিল কৃষিজমি ও গৃহশিল্প। গৃহশিল্পগুলোর কাঁচামালও ছিল কৃষিজাত পণ্য। এগুলো গ্রামেই সহজ লভ্য ছিল।

নগরে জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল বেশি। সেখানে কৃষিজমি সহজ লভ্য ছিল না। নগর গড়ে উঠেছিল প্রশাসনিক কার্য পরিচালনার জন্য। সেখানে পারস্পরিক সহযোগিতার বড় অভাব ছিল। সকলেই ছিল নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। অন্যদিকে গ্রাম গড়ে উঠেছিল পরস্পর আত্মীয়তা এবং সহযোগিতার বন্ধনে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ।

প্রাচীনকালেও নগরে বসবাস করত রাজ-রাজা, রাজ-কর্মচারী, সামন্ত প্রভু, বণিক, শিল্পী, করণিক প্রমুখ। তাদেরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল নগরের ভৌত কাঠামো। তখনও গ্রামের সীমান্ত রেখা থেকে নগরগুলো দূরে অবস্থিত ছিল। বার বার লাঙলের আঘাতে পেছনে চলে গিয়েছিল অরণ্য আর অনাবাদি জমি। আর নগর নির্মিত হয়েছিল কৃষির উদ্বৃত্ত উৎপাদনে।

গ্রামের উৎপন্ন জিনিসগুলো নগরে নিয়ে যাওয়া হতো। লোকসমাজ নগর থেকে কিছুই পেত না। নগর গড়ে তোলার জন্য গ্রামের মানুষের উপর বড় রকমের চাপ পড়ত। গ্রামসমাজ গড়ে ওঠার পেছনেও ছিল কতকগুলো অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক

কারণ। বাজারের জন্য শস্য উৎপাদন করতে গিয়ে কৃষকদের মধ্যে স্তর ভেদের সৃষ্টি হয়েছিল। গৃহশিল্পীরা গ্রামেই বসবাস করত। পঞ্চম থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত গ্রামের চেহারা একই রকম ছিল। এ সময়ে গ্রামের উৎপাদন যন্ত্রগুলোর মধ্যে গরু, লাঙল, আখমাড়াই যন্ত্র ও তাঁতযন্ত্রই ছিল প্রধান। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হবার পরও কৃষি ও গৃহশিল্পগুলোর কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি।

প্রাচীন কালে বাংলায় লাঙল দিয়ে জমি চাষ করা হতো। ধীরে ধীরে এর ফলার উন্নতি ঘটে। কিন্তু চাষাবাদে ব্যবহৃত হয় বলদ। টেরি নামে একজন ইংরেজ একে 'পা-লাঙল' বলে উল্লেখ করেন। তার বর্ণনা মতে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে লোহা ছিল দুর্লভ। তার বর্ণনায় অনেক ইতিহাসবিদই আস্থাভাজন নন। কারণ শুকনো আর শক্ত মাটির জন্য লোহার ফাল ছিল অপরিহার্য।

টেরির সময়ে ভারতে ব্যাপকভাবে লোহা উৎপাদিত হতো। সে সময় ভারতীয় উৎপাদন ব্যবস্থা আদিম স্তরে ছিল না। ভারতীয় কৃষকরা বীজ রোপণ ও বপন করা সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিল। মাটির গুণাগুণ এবং ঋতু পরিবর্তন সম্পর্কে কৃষকরা অবহিত ছিল। তারা একই জমিতে বছরে দুইবার ফসল করত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনবার জমি থেকে ফসল উঠানো হতো।

মোগল আমলে বাংলার কৃষি সভ্যতা উন্নত পর্যায়ে পৌছেছিল। উৎপাদনের দিক থেকে ভারতের মধ্যে বাংলার চিনির পরিমাণ ও মান দুটোই ছিল উন্নত। এদেশের উল্লেখযোগ্য দিক ছিল বিশুদ্ধ কৃষির সঙ্গে কারিগরি শিল্পের মিলন। ধান উৎপাদনের ক্ষেত্রে কৃষকদের কাজ শস্য মাড়াইয়ের সঙ্গে শেষ হয়ে যেত। ধান ভানা হতো বাড়িতে। এ কাজ মহিলারাই করত। চাষীরা তুলো আর বীজ ছাড়াত। সেই তুলো ধুনত ধনিয়ারা। তারা ছিল যাযাবর শ্রমিক। তুলো থেকে সুতো বোনা হতো কৃষকের বাড়িতেই। গুড় ও চিনি গৃহস্থের বাড়িতে হতো। তেল বীজ থেকে তেল উৎপাদন করত 'তেলী' নামে একটি সম্প্রদায়। তারা বলদের সাহায্যে ঘানি টেনে তেল উৎপাদন করত।

একটি কিংবা কয়েকটি গ্রাম মিলে ছিল সুতো, কাপড়, চিনি, তেল লাঙলসহ নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্রের উৎপাদন এলাকা। পৃথক পৃথকভাবে ছিল জেলে পাড়া, তাঁতি পাড়া, কুমার পাড়া, ঘোষ পাড়া ইত্যাদি। ভারতের সকল অঞ্চলেই তাদের ঘর বাড়ি এক রকম ছিল না। বাংলার ঘরগুলো কুঁড়েঘর হিসাবে পরিচিত ছিল। কুঁড়েঘর ছিল খড় দিয়ে ছাওয়া। মাটি খুঁড়ে বাঁশ বেঁধে কুঁড়েঘর তৈরি করা হতো। উড়িষ্যায় ঘরের দেয়াল তৈরি করা হতো নলখাগড়া দিয়ে। বিহারের বেশিরভাগ বাড়ির চাল ছিল টালির। সিন্ধু নদীর তীরে গ্রামের ঘরগুলো ছিল কাঠ ও খড় দিয়ে তৈরি। আজমিরের সাধারণ মানুষ তাঁবুর ধাঁচে বাঁশের কুঁড়েঘর নির্মাণ করত। গুজরাটের বাড়িগুলোর চাল ছিল টালির। ঘরবাড়ি নির্মাণের আঞ্চলিক বৈচিত্র্যের মূল কারণ ছিল আবহাওয়া ও পরিবেশ।

বাংলায় মানুষ এসেছে আরাম-আয়েশের জন্য। গার্হস্থ্য জীবন, ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি নিয়ে বাঙালির মানস প্রকৃতি রচিত হয়েছিল। আর কৃষিভূমি ও বসতবাড়ি নিয়ে গঠিত হয়েছিল গ্রাম। গ্রামের বৃত্তি চেতনার উৎস ছিল সাম্যবাদী সমাজ। বাঙ্গালায় নগর তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি। পূর্তকর্ম হয়েছে ইটের সাহায্যে। এ অঞ্চলে পাথর এসেছে 'রাজমহল-বাঁকুড়া' ও 'মানভূম' অঞ্চল থেকে। এসব পাথরে বরেন্দ্র অঞ্চলে মন্দির নির্মিত হয়েছে। সুকুমার সেন বলেন, বাঙ্গালা দেশের গৃহস্থের ঘরের বিশিষ্ট ছাঁদের নাম ছিল বাঙ্গালা। পরে তা ইংরেজিতে হয়েছে 'বাংলো'। এর দেয়াল ছিল মাটির এবং বাঁশের কাঠামোর উপর খড়ের ছাদ। সাধারণ লোক তো বটেই এমনকি ধনীরাও সাধারণত মাটি, খড়, বাঁশ, কাঠ ইত্যাদির তৈরি বাড়িতে বসবাস করত। বাঁশ, বেত, খড়, ছন, নলখাগড়ার তৈরি ঘরে বসবাস করতেন রাজা, জমিদার বা সওদাগর প্রভৃতি উচ্চ বর্ণের লোকরা। দীনেশ চন্দ্র সেন তার ময়মনসিংহ গীতিকায় বলেন, ব্রিটিশ আসার পর থেকে টিনের ব্যবহার বাড়তে থাকে। বিশ শতকের তৃতীয়-চতুর্থ দশকেও ময়মনসিংহের গ্রামাঞ্চলে বাংলার গৃহনির্মাণ কলার নিপুণ কারুকাজ অবশিষ্ট ছিল।

পূর্ব ময়মনসিংহের 'জুইতের ঘর' ছিল সর্বজন পরিচিত। হাতির পিঠের মতো অর্ধবৃত্তাকার জুইতের ঘর বাংলার সর্বত্র এমনকি পশ্চিমবঙ্গেও পরিচিত ছিল। এগুলোকে পশ্চিমবঙ্গে বলা হতো রাগ বা কোর দেওয়া ঘর। মোঘল আমলে এ ধরনের ঘর দিল্লি, আগ্রা ও রাজস্থানেও প্রসিদ্ধ ছিল।

অঞ্চল নির্বিশেষে সর্বত্রই ঘরের বেড়ায় কারুকাজ করার রীতি প্রচলিত ছিল। বেড়া নির্মাণের সময় বাঁশ কিংবা বেতের ফালির সাহায্যে যে গেরো দেয়া হতো, তাতে থাকত বিভিন্ন নকশা বা আলপনা। এসব নকশার মধ্যে ছিল পদ্ম, পানপদ্ম, স্বস্তিকা, লতা-পাতা, ফুল-পাখি ইত্যাদি। দরজা-জানালায় শীতল পাটি বা আয়না সাজিয়ে গেরোর মোটিফগুলো প্রদর্শন করা হতো। বেড়াগুলোতে থাকত অসম্ভব সুন্দর কারুকাজ। কারুশিল্পীদের জন্য নির্মিত গৃহগুলোর নকশায়ও ছিল বৈচিত্র্য। শঙ্খ ও ঝিনুক শিল্পের জন্য নির্মিত ঘরগুলো ছিল টং-এর মতো উঁচু।

শঙ্খ ও ঝিনুক সাধারণত সমুদ্র উপকূলে পাওয়া যেত। এ ধরনের গৃহগুলো ছিল কক্সবাজার, পটুয়াখালী ও খুলনা এলাকায়। সেই আদলে লোকশিল্প জাদুঘরে শঙ্খ শিল্পীদের জন্য গৃহনির্মাণ করা হয়েছে, যাতে শঙ্খশিল্পীরা তাদের নিজেদের পরিবেশ বজায় রেখে কাজ করতে পারে। শঙ্খশিল্পীরা যখন কাজ করে, তখন জাদুঘরের দর্শকরা খুব মনোযোগ দিয়ে কাজ করার দৃশ্যগুলো দেখে।

প্রাচীনকালে শঙ্খ ও ঝিনুক শিল্পে বাংলাদেশ বিখ্যাত ছিল। হিন্দুদের বিয়ের অনুষ্ঠানে গায়ে হলুদের দিন ধান, দুর্বা ও সিঁদুরসহ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে হিন্দু রমণীদের সিঁদুর পরানো হয়। সিঁথির সিঁদুর ও হাতের শাখা সধবা হিন্দু

রমণীদের অপরিহার্য অলঙ্কার। সমুদ্র তীরে না হয়েও বহু শতাব্দী ধরেই ঢাকা শাঁখা শিল্পের কেন্দ্র হিসাবে বিখ্যাত ছিল। ক্যাপটেন থমাস উইলিয়ামসন ১৮১০ সালে রচিত গাইডে ঢাকার শাখা শিল্পের প্রসিদ্ধর কথা উল্লেখ করেন। শাখার নিচের ক্ষুদ্রাংশ ঘষে ঘষে মসৃণ করে চাকতি নির্মাণ করা হতো। চাকতি ফুটো করে তৈরি করা হতো শঙ্খের মালা। কোম্পানির ভারতীয় সেপাইরা এগুলো গলায় পরত। ১৯০৩ সালে দিল্লিতে ভারতীয় শিল্প প্রদর্শনীতে অংশ নিয়ে ঢাকার তারকা নাথ নাগ শাঁখার জন্য পুরস্কার লাভ করেন। শঙ্খের উপর কারুকাজের জন্য পুরস্কৃত হন প্রেমচন্দ্র শুর। এদেশের রমণীদের কাছে শঙ্খের তৈরি বালা, চুড়ি ও আঙটি খুবই প্রিয়। সপ্তদশ শতকে টেভার্নিয়ার ঢাকা ও পাবনার শাঁখাশিল্পীর সংখ্যা দুই হাজার বলে উল্লেখ করেন। ১৮৪০ সালে জেমস টেলর পাঁচশত জন শঙ্খশিল্পীর কথা উল্লেখ করেন। সে সময় ঢাকার বাৎসরিক মেলায় রঙিন শঙ্খের অলঙ্কার বিক্রি হতো।

একসময় ঢাকার গোলাপি মুক্তার গহনা বেশ বিখ্যাত ছিল। এসব মুক্তা সংগ্রহ করা হতো ময়মনসিংহ ও কুমিল্লার হাওর এলাকা থেকে। দামেও ছিল সস্তা। কান, নাক ও আঙুলের অলঙ্কারগুলোয় মুক্তা বসানো হতো। এসব মুক্তার সঙ্গে থাকত রুবি, পান্না ও ফিরোজা। গোলাপি মুক্তার সঙ্গে অন্যান্য রঙের মুক্তা বসিয়ে অলঙ্কারে বৈচিত্র্য আনা হতো। একাত্তরের স্বাধীনতার পরও পিঙ্ক পার্ল অর্থাৎ গোলাপি মুক্তার গহনা বেশ জনপ্রিয় ছিল। এর মূল কারণ ছিল রুচিশীল নকশা ও হালকা ওজন। সোনা, রূপা বা অন্য কোনো ধাতুর পাতে ফুল, লতা-পাতার নকশা উৎকীর্ণ করে সেখানে বসানো হতো মুক্তা। এতে সোনা বা রূপার পরিমাণ কম লাগত। এতে অলঙ্কারের দাম সস্তা পড়ত। মুক্তা ছিল বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ। হাওর-বাওর বিলে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত ঝিনুক। সেই ঝিনকের ভেতরে পাওয়া যেত মুক্তা। সেই প্রাকৃতিক সম্পদ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। ঝিনুক চাষের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ মুক্তা আহরণ বহু গুণে বৃদ্ধি করেছে। বিশেষ করে চীনের মুক্তার অলঙ্কার সারা বিশ্বে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বাংলাদেশেও মুক্তা চাষের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।

গ্রামের মধ্যেই গৃহশিল্পের উপকরণ পাওয়া যেত। মানুষের সব ধরনের নির্মাণ কাজের মধ্যেই ছিল শৈল্পিক কুশলতা। তারা নিজেরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল এবং তা পৌঁছে দিয়েছে উত্তর পুরুষের কাছে। এভাবেই তাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা অমূল্য শিল্প হিসাবে টিকে আছে। আর এগুলোই হচ্ছে লোকসংস্কৃতির প্রধান হাতিয়ার। প্রাচীন কালে সাধারণ মানুষ নিজেদের জীবনকে আনন্দময় করে তোলার উদযাপন করত বিভিন্ন উৎসব। তার উপভোগ করত নাচ, গান, যাত্রা, পুতুল নাচ ইত্যাদি।

মসলিন

(এক)

সোনারগাঁয়ে খাসনগর নামে একটি দিঘি আছে। এটি দিঘিরপাড় গ্রামে অবস্থিত। এখানে ছিল তাঁতীদের আবাসস্থল। জেমস টেলর তার 'দ্য টপোগ্রাফি অফ ঢাকা' গ্রন্থে লিখেছেন, 'এটি পানামনগর থেকে এক কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। দিঘির পানি স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ।' এই দিঘির পানিতে ধোয়া হতো সুতো। সেই সুতো দিয়ে বোনা হতো মসলিন। ইংরেজ আমলে দেড় হাজার মসলিন তাঁতী বসবাস করত দিঘির পাড়ে।

সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের প্রিয় বস্ত্র ছিল মসলিন। দিল্লির সম্রাট জাহাঙ্গীর মসলিন বস্ত্রের উন্নতির জন্য অর্থ ব্যয় করতেন। সম্রাট আওরঙ্গজেবও মসলিনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। 'Trigonometrical Survey of India' নামক গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা ও মেঘনা-এই তিন নদীর সংযোগ স্থলে প্রায় ১৯৬০ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে সমস্ত মসলিন উৎপন্ন হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্যন্ত ভারত ও এশিয়ার অন্যান্য স্থানে মসলিনের সমাদর ছিল।

১৬৬৬ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ঢাকাতে সর্বপ্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। এরপর থেকে তারা ঢাকার বস্ত্র ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। এমনকি ১৭০০ সালে স্কটল্যান্ডের প্রেইসলি নগরে ইংরেজরা ঢাকাই মসলিন প্রস্তুতের উদ্যোগ নেয়। এতে তারা সম্পূর্ণ সফল হয়নি। সাব-জর্জ বার্ডউড লিখেছেন, ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে নাটিংহাম নগরে মসলিন বস্ত্রকল প্রতিষ্ঠিত হলে ঢাকার মসলিন শিল্পের অবনতি আরম্ভ হয়। সে সময় থেকে মসলিনের উপর শতকরা ৭৫ টাকা কর ধার্য করা হয়। এত উচ্চ হারে কর দিয়ে ঢাকার তন্তুবায়গণ ইংল্যান্ডের বস্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে ওঠেনি। ঢাকার ইতিহাস প্রণেতা যতীন্দ্রমোহন রায় লিখেছেন, "ঢাকার বস্ত্রশিল্প স্বীয় মহিমায় জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল; এবং সেই সুযোগে জগতের ধনরাশি জাহ্নবীর ধারার ন্যায় ভারত সাগরে আসিয়া পতিত হইয়াছিল। ঢাকার শিল্পকূলকে রাজশক্তির বলে, অনুগ্রহ সাহায্যে, আপনাদের পণ্যদ্রব্য জগতের গৃহণীয় করিতে হয় নাই।" তন্তুবায়গণ বিচিত্র নাম ও নকশায় অলঙ্কৃত করেছে মসলিন। যেমন- ঝুনা, খাস, শবনম, নয়ন-সুক, বদন-খান, সেরবন্দ, সরবতি, মলমল খান, জঙ্গল খান ইত্যাদি।

ঝুনা শব্দের অর্থ সূক্ষ্ম। ইউরোপীয় লেখকরা ঝুনাকে অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন বস্ত্র হিসাবে বর্ণনা করেন। তারা মনে করতেন এ ধরনের বস্ত্র 'দেব বালাগণের করসম্ভূত'।

টেইলর সাহেব লিখেছেন, 'পরীকন্যারা মসলিন তৈরি করে।' খাস শব্দের অর্থ উৎকৃষ্ট। এই বস্ত্র দিল্লির সম্রাটদের ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করা হতো। আরেক ধরনের মসলিনের নাম 'শবনম', যার অর্থ সান্ধ্যশিশির। সন্ধ্যাকালে একে সবুজ ঘাসের উপর রাখা হলে সকালে নিষিক্ত 'দুর্বাদল' বলে ভ্রম হতো। আবরোচান নামের এক ধরনের মসলিন ছিল, যা পানির সঙ্গে মিশে যেত। একে পানি থেকে না উঠানো পর্যন্ত চেনা যেত না।

মসলিনের গুণাগুণ অনুসারে বিভিন্ন মসলিনের নাম রাখা হতো। বর্গাকৃতি বা চারকোণা মোটিফের মসলিনের নাম ছিল চারকোণা। ডোরাকাটা মসলিনের নাম ছিল ডোরিয়া। সম্রাটদের জন্য সংরক্ষিত মসলিনকে বলা হতো মালবুস খাস। নবাবদের জন্য সংরক্ষিত মসলিনকে বলা হতো সরকার-ই-আলী। শেঠ পরিবারের জন্যও সরকার-ই-আলী সংগ্রহ করা হতো।

সম্রাট ও নবাবদের জন্য মোগল সরকার একজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা নিযুক্ত করতেন। তাকে দারোগা-ই-মালবুস খাস বা তাঁতখানা বলা হতো। এ ধরনের কাজের জন্য স্থাপিত সংস্থাকে বলা হতো 'মালবুস খাস কুঠি'। ১৭২৩ থেকে ১৭২৬ পর্যন্ত দারোগা-ই-মালবসু পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন শ্রীনাথ এবং ১৭৩৬ থেকে ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন সিরাজ-উদ-দীন মোহাম্মদ (অথবা মাহমুদ)। তারা তাঁতিদের বয়ন প্রক্রিয়া পরিদর্শন করতেন, যাতে তাঁতিরা মোগল সম্রাট এবং বাংলার নবাবদের জন্য বয়ন করা মসলিন বয়নের কাজে ফাঁকি দিতে না পারে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানি লাভের পর দারোগার অফিস এবং সংস্থাপনা বন্ধ হয়ে যায়।

বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্পের সুনাম খ্রিস্টের জন্মের বহু আগেই ছড়িয়ে পড়েছিল। কোটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বঙ্গদেশের বস্ত্রের উল্লেখ আছে। নীহাররঞ্জন রায় তার 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' গ্রন্থে ইবনে খুর্দদবার কথা উল্লেখ করেন, যিনি রহম দেশের নাম উল্লেখ করেছেন। এর অর্থ চট্টগ্রাম। আরবদেশীয় বণিক সুলেমান বলেন, এদেশে সূক্ষ্ম ও সুকোমল বস্ত্র উৎপন্ন হয়। অন্য কোনো দেশে এত সূক্ষ্ম বস্ত্র উৎপন্ন হয় না। এ বস্তু এত সূক্ষ্ম ও কোমল যে একটা আংটির ভেতর দিয়ে তা চালিয়ে দেয়া যায়। ত্রয়োদশ শতকের প্রথম ভাগে চীনের পরিব্রাজক চাও-জু-কুরা পিং বাংলাদেশ সম্বন্ধে বলেন, এদেশে দুমুখো তলোয়ার তৈরি হয় এবং কার্পাস ও অন্যান্য বস্ত্র উৎপন্ন হয়। পঞ্চদশ শতকে চীনা পরিব্রাজক মাহুয়ান (১৪০৫) চট্টগ্রাম ও সোনারগাঁও ভ্রমণ করে গৌড় রাজধানী সম্পর্কে বলেন, এ রাজ্যের নগরগুলো প্রাচীর বেষ্টিত। অধিবাসীরা কৃষ্ণবর্ণ এবং মুসলমান। ভাষার নাম বাঙলা। তবে পারসি ভাষার ব্যবহারও আছে। মুদ্রার নাম টঙ্কা। কড়ির ব্যবহারও আছে। সমস্ত বছর ধরে চীন দেশের গ্রীষ্মকালের মতন গরম। নানা প্রকার ধান, যব, গম ও সর্ষে এদেশের প্রধান শস্য। এদেশে নারকেল, ধান, তাল ও কাজঙ্গ থেকে মদ তৈরি হয়। তার বর্ণনায় ফলের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে কলা, কাঁঠাল, ডালিম ও আখের নাম। তিনি আরো বলেন, এদেশে ছয় প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত হয়। এ বস্ত্র

সাধারণ প্রস্থে দুই হাত এবং দৈর্ঘ্যে উনিশ হাত। এদেশে রেশমের কীট পালিত হয় এবং রেশম বস্ত্র বয়ন করা হয়।

শবরপার একটি পদে রয়েছে-

বাড়ির বাগানে কার্পাস ফুল ফুটেছে

দেখেই আনন্দ

প্রাচীন কালে কার্পাস উৎপাদনকে অত্যন্ত মূল্য দেয়া হতো। কার্পাস ও গুটিপোকার চাষ এবং এসব দিয়ে বস্ত্র উৎপাদনই ছিল প্রাচীন বাংলার প্রধান শিল্প। ইংরেজ আসার পর এদেশের বস্ত্র শিল্প ধ্বংস হয়ে যায়। মেশিনে উৎপাদিত বস্ত্রে বাংলাদেশ ছেয়ে যায়। মেশিনে উৎপাদিত বস্ত্রের সঙ্গে হাতের তৈরি বস্ত্র প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে। মসলিন বস্ত্র বিলুপ্ত হয়ে যায়। জামদানি শাড়ি কোনো রকমে টিকে থাকে।

মধ্যযুগে জামদানি তাঁতীরা শাড়ির জন্য বিচিত্র রকমের পাড় বয়ন করতেন। পাড়ে বৈচিত্র্য আনার জন্য বিভিন্ন গাছের পাতা ও লতার প্রাধান্য দিতেন। পাড়ে পাতার নকশার মধ্যে ছিল পুঁইপাতা, বেলপাতা, বটপাতা, সজনে পাতা, চালতা পাতা, নিমপাতা ইত্যাদি। ফুলের নকশার মধ্যে ছিল কলকা, কচুরি, বউল, চালতা, ডালিম, মান্দার, শাপলা, পদ্ম ইত্যাদি। অন্যান্য নকশার মধ্যে ছিল মাদুলি, করাত, চৌকি, আম, শামুক, ডালা, ঘুড়ি, আঙ্গুট, পুটিমাছ, পাখি, ফড়িং, প্রজাপতি, চশমা, জাল, শঙ্খ, ঝিনুক, জাম্বুরা, গাছ, পাখি, নৌকা, পালতোলা নৌকা ইত্যাদি।

জামদানি শিল্পীরা তাদের চেনা-জানা পরিবেশ থেকে নকশাগুলো নিত। একই ধরনের নকশা বিভিন্ন তাঁতীরা ব্যবহার করত। প্রায় ষোল ধরনের কারিগর জামদানি শাড়ি বয়নের সঙ্গে জড়িত ছিল। ধলেশ্বরী ও শীতলক্ষ্মা নদীবেষ্টিত এলাকায় মসলিন ও জামদানি কারিগরদের বসতি গড়ে উঠেছিল। পরিবর্তনের আঘাতে মসলিন শিল্প অবলুপ্ত হয়ে যায়।

(দুই)

১৪৬২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মিশরের অষ্টাদশ রাজবংশের শেষ পর্যায়ে অধিকাংশ মমী মসলিনে আবৃত করা হতো। প্রাচীন বেবিলন, মিশর, গ্রিস ও রোমে বাংলাদেশের মসলিনের পরিচিতি ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বঙ্গ তথা পূর্ববঙ্গের সূক্ষ্ম বস্ত্রের কথা উল্লেখ আছে। খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে রচিত 'Periplus of the Erythrean Sea' গ্রন্থে মসলিন বস্ত্রের উল্লেখ রয়েছে। চর্যাগীতির পংক্তিতে কার্পাস চাষের কথা উল্লেখ আছে। ত্রয়োদশ শতকে মার্কোপোলো বাঙলার কার্পাস বস্ত্রের কথা উল্লেখ করেন। চতুর্দশ শতকে ইবনে বতুতা সোনারগাঁয়ে উৎপাদিত ছয় প্রকার সূক্ষ্ম বস্ত্রের কথা উল্লেখ করেন। মসলিন এত সূক্ষ্ম ছিল যে এক পাউন্ড সুতোর দৈর্ঘ্য ছিল ২৫০ মাইল। একটি উপকথায়

প্রচলিত আছে একদিন সম্রাট আওরঙ্গজেবের সামনে তার কন্যা জেবুন্নিসা মসলিন পরে উপস্থিত হন। সম্রাট তার কন্যাকে বে-আব্রু বলে ভর্ৎসনা করেন। উত্তরে জেবুন্নিসা বলেন, 'জাঁহাপনা, সাত ফের্তা বাংলার মসলিন পড়ে আছি।'

নবম শতাব্দীতে আরব পরিব্রাজক সোলায়মান ভারত ভ্রমণকালে পূর্ববঙ্গের মসলিনের সূক্ষ্ম বুনন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, 'এখনকার সুতিবস্ত্র এত সূক্ষ্ম যে, এক খণ্ড পোশাক একটি ক্ষুদ্র আঙটির মধ্য দিয়ে অনায়াসে বের করা যায়।' সোনারগাঁয়ের স্বাধীন সুলতান গিয়াস উদ্দীন আযম শাহ এক পংক্তি ফার্সি কবিতা লিখে শেখ সাদীর কাছে পাঠান পরবর্তী চরণ লিখে দেয়ার জন্য। একই সঙ্গে পাঠান আমন্ত্রণপত্র ও মসলিন।

মসলিন ছিল যেমনি সূক্ষ্ম, তেমনি শুভ্র। সাধারণত এর পাড় ও জমিনে উজ্জ্বল রঙ ব্যবহার করা হতো না। তবে শুভ্র বস্ত্রের উপরই বিভিন্ন নকশার ছাপ মারা হতো এবং সুঁই-সুতোর কারুকাজ করা হতো।

যে সব এলাকায় মসলিন বয়ন করা হতো, সে সব এলাকা কার্পাস তুলো উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। তাঁতিরাই কার্পাস চাষ করত, তাঁতযন্ত্র তৈরি করত, কার্পাস সংগ্রহ করত, সুতো কাটত এবং কাপড় বুনত। তাঁতযন্ত্র নির্মাণের প্রয়োজনীয় কাঠ ও বাঁশ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হতো। বছরের অর্ধেক সময় খোলা উঠানে তাঁতের কাজ চলত। প্রয়োজন হলে তাঁতি তার তাঁত নিজগৃহে সরিয়ে নিত। রফতানি ছাড়া আর কোনো কাজের জন্য মসলিন শিল্পীরা বাইরের জগতের উপর নির্ভরশীল ছিল না। তাঁতযন্ত্রের জন্য ব্যবহৃত এক টুকরো লোহাও স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করা হতো। সব কার্পাসই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল-ফুটি কার্পাস ও বয়রাতি কার্পাস। ফুটি কার্পাস অধিকতর উন্নত ছিল। উন্নত মসলিন বুননের জন্য ফুটি কার্পাসের সুতো ব্যবহৃত হতো। নিম্ন মানের মসলিন বোনা হতো বয়রাতি কার্পাসের সুতো দিয়ে।

বছরে দুইবার কার্পাস বপন করা হতো। প্রথম ফসল তোলা হতো বসন্তকালে। দ্বিতীয় ফসল সংগ্রহ করা হতো শরৎকালে। বসন্তকালে সংগৃহীত কার্পাস অধিকতর উৎকৃষ্ট ছিল। কার্পাস পরিষ্কার করার জন্য বোয়াল মাছের চোয়ালের দাঁত ব্যবহার করা হতো। উন্নত মানের কার্পাস থেকে মসলিনের সুতো কাটা হতো। সূক্ষ্ম সুতো কাটার জন্য প্রয়োজন ছিল আর্দ্রতার। সূক্ষ্মতম সুতো কাটার সময় ছিল খুব ভোরবেলা, শিশির শুকানোর পূর্ব পর্যন্ত। এছাড়া বিকেল বেলা সূর্যাস্তের আগ পর্যন্ত সুতো কাটা হতো। আর্দ্র আবহাওয়ার অভাব হলে নৌকায় করেও সুতো কাটা হতো।

সূক্ষ্মতম সুতো কাটার জন্য দুটি বিশেষ গুণের প্রয়োজন ছিল–প্রথমত প্রখর দৃষ্টি শক্তি এবং দ্বিতীয়ত আঙুলের প্রখর সংবেদনশীলতা। এ কারণে খুব কম বয়সী এবং বেশি বয়সী তরুণীরা মসলিন সুতো কাটতে পারত না। এই দুই বয়সের মাঝামাঝি বয়সের তরুণীরা সুতো কাটত। এ রকম নিপুণ সুতো কাটুনির সংখ্যা খুবই কম ছিল।

টেইলর লিখেছেন, এ রকম সুতো কাটুনীর সংখ্যা ছিল ঢাকায় তিনজন, সোনারগাঁও-এ ৬/৭ জন এবং জঙ্গলবাড়ি ও বাজিতপুরে বিশজন। ঢাকায় প্রস্তুত সুতো ম্যানচেস্টারের কলে প্রস্তুত সূক্ষ্ম সুতোর চেয়েও সূক্ষ্মতর ছিল। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, মসলিনে ব্যবহৃত সবটুকু সুতোই সমপরিমাণ সূক্ষ্ম ছিল।

ইতিহাসবিদ আবদুল করিমই মসলিনের উৎকর্ষের দুটি কারণ উল্লেখ করেন। প্রথমত ঢাকার ফুটি কার্পাসের দ্বারা প্রস্তুত সুতো ধোয়ার ফলে ফুলে উঠত না। বরং সঙ্কুচিত হয়ে যেত। যে সুতো ধোয়ার সময় ফুলে না ওঠে এবং সঙ্কুচিত হয়, সে সুতো উত্তম। কারণ সে সুতোয় বুননী ঘন হয় এবং কাপড় টেকসই হয়। ম্যানচেস্টারের কলে প্রস্তুত সুতো ধুলে ফুলে উঠত এবং অপেক্ষাকৃত কম টেকসই ছিল। দ্বিতীয়ত মসলিন শাড়ির সূক্ষ্মতা নির্ভর করত সুতো কাটার সময় আঙুলের টিপের উপর। যত বেশি টিপে মোড় দেয়া হতো, সুতো তত বেশি সূক্ষ্ম হতো। এ ব্যাপারে ঢাকার সুতোকাটুনীরা অত্যন্ত দক্ষ ছিল।

ক্লোরিন আবিষ্কৃত হওয়ার দুইশত বছর আগেও ঢাকার ধোপারা কাপড় ধোয়ায় নিপুণ ছিল। আবুল ফজল লিখেছেন, সোনারগাঁও-এর অন্তর্গত এগারসিন্দুর নামক স্থানের পানি কাপড় ধোয়ার জন্য উৎকৃষ্ট ছিল। কাপড় ধোয়ার জন্য উপযুক্ত সময় ছিল জুলাই থেকে নভেম্বর মাস। সে সময় নদীতে পরিষ্কার পানি থাকত এবং বাতাসেও ধুলোবালি কম থাকত।

আঠার শতকের প্রথম পাদে একখানি সূক্ষ্মতম মসলিনের ধোয়া ও মেরামত খরচ পড়ত প্রায় দশ টাকা। অনেক সময় দেখা যেত, ধোয়ার পর মসলিনের সুতো অবিন্যস্ত হয়ে গেছে। তখন সুতো বিন্যস্ত করার জন্য দক্ষ কারিগরকে দেয়া হতো। যারা মসলিনের সুতো বিন্যস্ত হবার কাজ করত, তাদেরকে বলা হতো নূরদিয়া।

ধোয়ার সময় সুতো নষ্ট হয়ে গেলে রিফুকাররা রিফু করে দিত। ঢাকার রিফুকাররা রিফু কাজে ছিল অত্যন্ত দক্ষ। মসলিন ধোয়ার পর যদি দেখা যেত, মসলিনে কোনো মোটা সুতো ব্যবহৃত হয়েছে, তা হলেই রিফুকাররা মোটা সুতো বদলে চিকন সুতো ভরে দিত। মসলিনের দাগ মোছার জন্য ব্যবহার করা হতো আমরুলের রস, লেবুর রস, ক্ষার, ঘি ইত্যাদি। লোহার দাগ মোছা হতো আমরুলের রস দিয়ে। নীল ও কচুর দাগ মোছা হতো ঘি, লেবুর রস ও ক্ষার দিয়ে।

কণ্ডুগার নামক একটি সম্প্রদায় মসলিন মোলায়েম করার কাজ করত। মসলিন মোলায়েম করা হতো শঙ্খ দিয়ে। মোটা কাপড় নরম করার জন্য ব্যবহার করা হতো ছোট ছোট মুগুর। বেশিরভাগ মসলিনের নাম ছিল ফার্সি ও আরবী। এ থেকে বোঝা যায়, মুসলমান আমলে রকম ভেদে মসলিনের নাম করা হয়। এর আগেও মসলিন উৎপাদিত হতো। মসলিনের পূর্ণ বিকাশ ঘটে মুসলমান আমলে। সুলতান আমলে এর কদর ছিল। কিন্তু মোগল আমলই ছিল মসলিন বিকাশের স্বর্ণযুগ।

ইংরেজ আগমনের আগে এদেশের রাষ্ট্র ভাষা ফার্সি ছিল। মসলিনের নামকরণেও ফার্সির প্রভাব পড়ে। ইউরোপীয় বণিকদের ব্যবসা শুরু হয় মোগল আমলে। মোগল শাসনের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে মসলিন শিল্পেরও অবনতি ঘটে। ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় মোগল রাজধানী স্থাপিত হবার পর ঢাকায় বিদেশী ব্যবসায়ীদের আনা-গোনা শুরু হয়। এর প্রমাণ পাওয়া যায় মির্জা নাথানের 'বাহারিস্তান-ই-গায়বী' নামক গ্রন্থে। ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দে সেবাস্টিন ম্যানরিক ঢাকা সফর করার পর লেখেন, ঢাকায় 'বিচিত্র জাতি' বসবাস করে।

সতেরো শতকের প্রথম দিকে পর্তুগিজরা মসলিন ব্যবসায় নিয়োজিত হয়। এ সময়েই আর্মেনিয়ান, ইরানি, তুরানি, মোগল, পাঠান প্রমুখ বণিকরা মসলিন ব্যবসায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। সতেরো শতকের মধ্যবর্তী সময়ে ইউরোপীয় বণিকরা যেমন ওলান্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসিরা ঢাকা নগরে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। তাদের হাতে মসলিন ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠলেও তাঁতিদের জন্য তারা কিছু করেনি। বরং অধিক মুনাফার লোভে তাঁতিদের উপর তাদের শোষণের মাত্রা বেড়ে যায়। ১৭৬৭ সালে ইংরেজ তত্ত্বাবধায়ক কেলছান ইংরেজ কোম্পানিকে কাপড় সরবরাহ না করায় তাঁতিদের ডেকে এনে বেদম প্রহার করেন। কাশিম বাজারের সিল্ক শিল্পীদের উপর নির্যাতনের কাহিনী থেকে জানা যায়, ইংরেজরা সিল্ক শিল্পীদের উপর এত অত্যাচার করতে যে, শিল্পীরা নিজেদের কাছ থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য নিজেদের আঙুল নিজেরাই কেটে ফেলে। ঢাকাতেও অনুরূপ ঘটনা ঘটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

ঢাকার তাঁতিরা চাহিদার সঙ্গে সংগতি রেখে মসলিন উৎপাদন করতে পারেনি। তাদের সম্বল ছিল মান্ধাতা আমলের টাকু, মাকু এবং তাঁত। কারখানার উৎপাদিত সুতোর সঙ্গে হাতে উৎপাদিত সুতোর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ঢাকার তাঁতিরা পিছিয়ে পড়ে। ফলে মসলিনের তাঁতযন্ত্রগুলো একের পর এক অচল হয়ে যায়।

মোগল সম্রাটরাই ছিলেন মসলিনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তাদের শাসনের অবসান হবার পর মসলিন আর কোনো পৃষ্ঠপোষকতা পায়নি। একসময় কারুশিল্পের জগত থেকে মসলিন হারিয়ে যায়। ইতিহাসের অংশ হিসাবে মসলিন স্থান করে নেয় জাদুঘরে।

পুতুল নাচ

ল্যাটিন Pupa শব্দ থেকে Puppet শব্দের উৎপত্তি, যার অর্থ পুতুল। বেশিরভাগ পুতুল হচ্ছে মানুষ ও জীব-জন্তুর আদলে নির্মিত। প্রাচীন কালে মানুষ প্রকৃতির বাধা-বিপত্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য গাছ, পাথর ও বন্য জন্তুর পূজা করত। মানুষ ক্রমে ক্রমে তার সেই ভাবনাকে মূর্তির আকারে প্রকাশ করে। পুতুলের জন্ম গুহা মানুষের হাতে। উত্তর-পশ্চিম বেলুচিস্তান ও মহেঞ্জোদাড়ো অঞ্চলেও মাটির তৈরি পুতুল পাওয়া গিয়েছে।

ধর্মীয় ভক্তিশ্রদ্ধা জড়িত অতীত কালের ক্ষুদ্র মূর্তির নাম পুতুল। সম্ভবত প্রাচীন কালে মিশর, গ্রিস ও রোমে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে পুতুল খেলার প্রচলন ছিল। পুতুল তৈরির মধ্যে যেমন মানুষের শিল্প রুচির পরিচয় রয়েছে, তেমনি পুতুল নাচও লোকশিল্পের অন্তর্ভুক্ত। সভ্যতার শুরু থেকেই পুতুল নাচের আবেদন ছিল। আদিম-কালে মানুষ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে পুতুলের সামনে নেচেছে। একইভাবে পুতুলকে নিজের নাচের সঙ্গী করেছে। এর সঙ্গে যাদুবিদ্যা ও ধর্মের নিবিড় সম্পর্ক ছিল। পঞ্চম শতাব্দীর দিকে মিশরে দেবতার সচল অবয়ব প্রদর্শিত হতো মিছিলে। ধীরে ধীরে নাট্যকলার মতো পুতুল নাচও ধর্মীয় আবর্ত থেকে মুক্ত হয়ে স্বতন্ত্র শিল্প মাধ্যম হিসাবে গড়ে ওঠে।

বাংলাদেশে পুতুল নাচে ব্যবহৃত কাহিনী দু'ধরনের- ধর্মীয় ও লৌকিক। ধর্মাশ্রিত পুতুল নাচের মধ্যে রয়েছে রামায়ণ, মহাভারত, রাধাকৃষ্ণ, সীতাহরণ প্রভৃতি। কিন্তু সমাজে এসব কাহিনীর আবেদন কমে যাবার ফলে বিভিন্ন রূপকথা ও সামাজিক কাহিনী এর স্থান দখল করে নেয়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে রহিম বাদশা, অসুর বধ, দুই সখীর নৃত্য, এক মেয়ের নৃত্য ইত্যাদি। এর সঙ্গে যোগ হয় সমস্যা নির্ভর কিছু সামাজিক কাহিনী। এসব কাহিনীর মধ্যে রয়েছে সুখী পরিবার, শিশুশিক্ষা, বয়স্কশিক্ষা, ফসল কাটার গান ইত্যাদি। এসব কাহিনীর সঙ্গে থাকে সিনেমার জনপ্রিয় গান ও নাচ। পুতুল নাচ লোকশিল্প হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবার পর গান কাহিনীর অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পুতুল নাচের কাহিনীর যেমন পরিবর্তন ঘটেছে, তেমনি গানে এসেছে বৈচিত্র্য। এতে পাঁচালির পরিবর্তে সংযোজিত হয়েছে মুর্শিদী ও মরমি গান।

মধ্যযুগের গীতি কবিতাগুলো বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এ ধরনের গান গাইবার জন্য রচিত হয়েছিল। লোক-ব্যবহারে গানগুলো সজীব রয়েছে। প্রাচীন কালে দুই ধরনের সংগীতের আসর বসত। একটি স্থাবর, অপরটি জঙ্গম। স্থাবর আসর দেব-

মন্দিরের সামনে বসত। অন্যত্র বসলে ঘট অথবা দেব-মূর্তি সামনে রাখা হতো। দেব-মাহাত্মময় গীত দীর্ঘ হলে তা বস্তু জাতীয় পাত্রপাত্রী অর্থাৎ পঞ্চালিকা অর্থাৎ পুতুলের সাহায্যে দেখানো হতো।

গানের জঙ্গম আসরকে বলা হতো 'যাত্রা'। পূজা বা উৎসব উপলক্ষে দেবতাকে রথ, শকট অথবা পালকিতে চড়িয়ে ভক্তরা শোভাযাত্রা করে নাট্যগীত পরিবেশন করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেত। দেবতার শোভা যাত্রা থেকে 'যাত্রা' কথাটি এসেছে। সুকুমার সেনের মতে, প্রাচীন কালে নৃত্যাভিনয় দুই রকম ছিল-'পাত্র-নৃত্য'ও 'প্রেরণ-নৃত্য'। পাত্র-নৃত্যে দেব বা মানব ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য পাত্র-পাত্রীকে মুখোস ও সাজ পরানো হতো। প্রেরণ-নৃত্য স্বাভাবিক বেশে নৃত্য। সুকুমার সেন মনে করেন, 'প্রেরণ' কথাটি প্রাচীন পুতুল নাচানো থেকে এসেছে। এদেশে নাটকাভিনয়ের উদ্ভব হয়েছে পুতুল নাচ থেকে। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙলায় পুতুল নাচ খুব জনপ্রিয় ছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন, "কাষ্ঠের পুতুল নাচ যেন কুহকে নাচায়।"

প্রাচীন ও মধ্যযুগে দীর্ঘ গান পরিবেশনের জন্য পুতুল ব্যবহার করা হতো। আধুনিক কালে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কাহিনী ও সামাজিক সমস্যা। দেশে মেলা ও উৎসবকে কেন্দ্র করে পুতুল নাচ অনুষ্ঠিত হয়। সোনারগাঁও জাদুঘরে নববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে পুতুল নাচে ব্যবহৃত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের বার-তেরটি গান। একই সঙ্গে অভিনীত হয়েছে সর্প-নৃত্য, কাহিনী নাট্য ইত্যাদি।

দর্শকদের রুচির দিকে লক্ষ্য রেখে পুতুল নাচের কারিগররা পুতুল নাচ পরিবেশন করেন। তারা বলেন, 'অভিজাত মহলে বিয়ে ও জন্ম দিনে আমাদের ডাক পড়ে। তাদের চাহিদার দিনে নজর রেখে আমরা পুতুল নাচের দল গঠন করেছি।'

ঐতিহ্যবাহী পুতুল শিল্পীরা পুতুলের সংলাপ সরাসরি মুখে বলেন না। তালপাতার তৈরি বিশেষ শ্রেণীর বাঁশির সাহায্যে তারা কথা বলেন এবং দুই-একটি সংলাপ মুখেও বলেন। পুতুল নাচের সময় যে সব বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে ঢোল, বাঁশি, জুড়ি, সানাই, হারমোনিয়াম ইত্যাদি।

একসময় ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বরিশাল, ফরিদপুর, খুলনা, কুষ্টিয়া, যশোর ও রংপুর পুতুল নাচের জন্য বিখ্যাত ছিল। লোকসমাজে পুতুল নাচের কদর কমে যাবার কারণে বেশির ভাগ দলই উঠে গিয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পুতুল নাচের প্রচলন রয়েছে। বিশেষ করে জাপান ও ভারতের পুতুল নাচ খুবই উন্নত। এসব দেশের পুতুল নাচের গল্প, সংলাপ ও অভিনয় রীতির পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে তা অনেক উন্নত হয়েছে। কিন্তু লোকশিল্পের চরিত্র হারিয়ে ফেলেছে। এখন সাধারণ দর্শকদের কাছে পুতুল নাচের কদর নেই। এ কারণে অভিজাত দর্শকদের রুচির কথা মনে রেখে পুতুল নাচের রূপান্তর ঘটানো হয়েছে।

যাত্রা

প্রাচীনকালে বঙ্গ দেশে যাত্রা প্রচলিত ছিল। সংস্কৃত ভাষায় যাত্রা অর্থ উৎসব। এটি গমন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন-রথযাত্রা, দেবীযাত্রা, কৃষ্ণযাত্রা ইত্যাদি। একসময় যাত্রা ছিল গণআনন্দ মাধ্যম। বাংলা নাটকের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় যাত্রা পেরে ওঠেনি। ফলে যাত্রা সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারেনি। যাত্রা ও নাটকের পার্থক্যের মূলে রয়েছে পরিবেশনার ভিন্ন ভঙ্গী। যাত্রাতে সংলাপ উচ্চারণের রয়েছে একটি চড়া সুর। অঙ্গ সঞ্চালন ও দৃষ্টি নিক্ষেপ অনেকটা অতি রঞ্জিত।

যাত্রার ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে নৃত্যগীতি। যাত্রা হচ্ছে অ্যাকশন প্রধান গীতিকা। কবি জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দ' এবং পরবর্তী কালে 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন'-এর মধ্যে যাত্রার নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে বিভিন্ন পূজা-পার্বণে মন্দির থেকে দেব-দেবীর মূর্তি নিয়ে নৃত্যগীত সহকারে শোভাযাত্রা করা হতো। শোভাযাত্রার মাধমে গ্রাম বা নগর প্রদক্ষিণ করা হতো। শোভাযাত্রা শেষে দেবদেবীকে যথাস্থানে স্থাপন করে ভক্তরা পালাগান গাইত। অনুষ্ঠান স্থানটিকে বলা হতো নাটমণ্ডপ। যে সব মন্দিরে উচ্চ নাটমণ্ডপ ছিল না সেখানে অনুষ্ঠান হতো সমতল ভূমিতে।

চৈতন্য দেবের আগে সম্ভবত যাত্রার চরিত্র ছিল তিনটি। তখন চরিত্রগুলো কোনো রূপসজ্জা গ্রহণ করত না। পরবর্তী সময়ে চরিত্রের সংখ্যা বাড়ে এবং চরিত্রানুগ রূপসজ্জার প্রচলন শুরু হয়। 'চৈতন্য চরিতামৃত' 'চৈতন্য মঙ্গল,' 'চৈতন্য ভাগবত' প্রভৃতি গ্রন্থে যাত্রাভিনয়ের কথা উল্লেখ রয়েছে। প্রাচীনকালে কৃষ্ণ বিষয়ক পালাগান বা যাত্রা সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল। অষ্টাদশ শতক থেকে ভ্রাম্যমাণ যাত্রা দল গড়ে ওঠে। উনিশ শতকের শেষ দিকে যাত্রা নির্দিষ্ট শিল্পরূপ গ্রহণ করে।

প্রাচীনকালে যাত্রা শুরুর আগে নান্দী বা বন্দনা অনুষ্ঠিত হতো। নান্দীর পরে অনুষ্ঠিত হতো প্রস্তাবনা। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে নান্দী বা মঙ্গলগীতি অনুষ্ঠিত হতো। নান্দীর ছিল দুটি ভাগ- প্রথমত দেবদেবীর বন্দনা এবং দ্বিতীয়ত দর্শকদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন। দেবদেবীর বন্দনা হতো নৃত্যগীতের মাধ্যমে, ধুপধুনো সহকারে। পরে হতো দর্শকদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান। প্রাচীনকালে নৃত্যগীত ও অভিনয় একসঙ্গে হতো। উনিশ শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত যাত্রা ছিল মূলত সাংগীতিক। উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে সংগীতের প্রাধান্য হ্রাস পেয়ে গদ্য সংলাপের প্রাধান্য বাড়তে থাকে।

সব সময় যাত্রায় যন্ত্রসঙ্গীতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রাচীনকালে যাত্রায় ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে ছিল মন্দিরা, খোল, করতাল, বাঁশি, ঢোল প্রভৃতি। উনিশ শতকে ইংরেজদের প্রভাবে যে সব পাশ্চাত্যের বাদ্যযন্ত্রের সমাবেশ ঘটে সে সব বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে রয়েছে হারমোনিয়াম, বেহালা, ক্লারিওনেট প্রভৃতি। যাত্রা পালায় বিবেক চরিত্রটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচীন যাত্রায় এই চরিত্রটি ছিল না। অহিভূষণ ভট্টাচার্যের 'সুরথ উদ্ধার' (১৩০১) পালায় প্রথম বিবেক চরিত্রটির সূত্রপাত ঘটে। বিবেকের কণ্ঠে গীত প্রথম গান হচ্ছে-

আপন বুঝে চল এই বেলা।
ঐ বাস্তু শকুন উড়ছে মাথায় গো
বসে যুক্তি দিচ্ছেন হাড়গেলা।

যাত্রায় 'জুড়ি গান'-এর প্রচলন ছিল। যাত্রা পালায় সব অভিনেতা গান গাইতে পারে না। এ জন্য অভিনীত চরিত্রের মনের ভাবকে ফুটিয়ে তোলার জন্য সমবেত কণ্ঠে গান অনুষ্ঠিত হতো। সমবেত কণ্ঠে গাওয়া গানকেই জুড়ি গান বলে। উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে যাত্রায় জুড়ি গানের প্রচলন হয়। জুড়ি গান যাত্রার প্রধান উপকরণ হিসাবেই টিকে আছে। ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে এশিয়াটিক জার্নালে 'কলিরাজার যাত্রা'র শেষ দৃশ্য সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়, 'সকলেই একত্রিত হইয়া নৃত্যগীত এবং রং-তামাশায় দর্শকগণকে এমন তৃপ্তি দান করে যে অভিনয়ের জন্য উহার বেশ সুযশ হয়।'

দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের মানুষ যাত্রাকে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেছে। পালাগানের সঙ্গে যাত্রার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। মূলত পালাগান হচ্ছে যাত্রার সংস্কৃত রূপ। পালাগানের সঙ্গে যাত্রার পার্থক্য হচ্ছে পালাগানে গদ্যের স্থান সামান্য। যাত্রায় গদ্যের প্রাধান্য। যাত্রায় দার্শনিকতার স্থান থাকে না। পালাগান তত্ত্বমূলক। যুগের সঙ্গে পালাগানের আঙ্গিকের পরিবর্তন হয়েছে। আগের দিনে কৃষকরা গুনাই যাত্রা, মৈফল রাজার পালা, জামাল বাদশার পালা ও রাজবিদ্যার পালা ক্ষেত-খামারে গাইত। অনেক পরিচিত রূপকথাও পালাগানে রূপান্তরিত হয়েছে। যেমন- রূপবান যাত্রা। যাত্রার আবহমান উদ্দেশ্য ছিল ধর্মচিন্তাকে সম্বল করে সমাজে লোকশিক্ষার বিস্তার করা। পরবর্তী সময়ে যাত্রার মাধ্যমে ইতিহাস ও সমাজকে তুলে আনা হয়। যাত্রার জ্বালাময়ী সংলাপ সহজেই দর্শকদের বিমোহিত করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকেও যাত্রার আঙ্গিকের প্রভাব রয়েছে। যাত্রা সম্পর্কে নাগরিক সমাজের ঔদাসীন্য যাত্রাকে বিকৃতির দিকে ঠেলে দিয়েছে। গ্রাম-গঞ্জ থেকে উঠে গিয়েছে যাত্রা।

যাত্রা শুরুর আগেই একটি রোমাঞ্চকর অনুভূতির সৃষ্টি করা হয় যাত্রার কুশীলবদের মধ্যে। দেড়-দুই ঘন্টা আগে যাত্রা দলের এক ব্যক্তি ঘন্টা বাজিয়ে সতর্ক করে দেয় কুশীলব ও যন্ত্রীদের। ঘন্টা বাজার পর পরই বাদ্যযন্ত্রগুলো মঞ্চের কাছে যথাস্থানে রেখে আসে যাত্রা দলের কর্মচারীরা। এরপর গ্রিনরুমে প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়। প্রার্থনা অনুষ্ঠানে

কীর্তন ঢঙের গান গাওয়া হয়। প্রার্থনা অনুষ্ঠানে গান গায় ছোট ছেলে-মেয়েরা, যারা সখীর দল হিসাবে থাকে। গানের নেতৃত্ব দেয় একটি ছোট ছেলে। তাকে বলা হয় 'একানী'। প্রয়োজন হলে যাত্রায় তাকে অভিনয় করতে হয়। সে গীতের মাধ্যমে অভিনয় সম্পন্ন করে। তার কাজ হচ্ছে যাত্রা শুরুর পূর্ব মুহূর্তে সখিগণের গানের পালা ঠিক আছে কিনা- তা পরখ করে দেখা। যাত্রার 'একানী' চরিত্রটি ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

প্রার্থনা অনুষ্ঠানের ব্যাপ্তী প্রায় এক ঘন্টা। প্রার্থনা অনুষ্ঠান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় 'ওপেনিং কনসার্ট'। কনসার্ট পয়তাল্লিশ মিনিট চলে। এরপর পনেরো মিনিট বিরতি। বিরতির পর দুটি ঘন্টা বেজে ওঠে। শুরু হয় দ্বিতীয় কনসার্ট। প্রথম কনসার্টের লয় ও তাল থাকে ধীর গতি সম্পন্ন। দ্বিতীয় কনসার্ট শুরু হয় দ্রুত লয়ে। পনেরো থেকে বিশ মিনিট কনসার্ট চলার পর শুরু হয় 'বন্দনা'।

পাকিস্তান আমলে যাত্রার বন্দনা ছিল না। তার পরিবর্তে শুরু হয় 'দেশ-বন্দনা'। দেশ-বন্দনার পর শুরু হয় বিচিত্রানুষ্ঠান। এর এক ঘন্টা পরে শুরু হয় 'এ্যাপিয়ার কনসার্ট'। এই কনসার্ট শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে অভিনেতা কিংবা অভিনেত্রী মঞ্চে প্রবেশ করেন। অনেক ক্ষেত্রে কনসার্ট চলাকালেই অভিনেতা সংলাপ শুরু করেন।

যাত্রা পালায় প্রচুর পরিমাণ যন্ত্র সংগীত, গান ও নাচ থাকে। এ পথ ধরেই যাত্রাতে প্রবেশ করেছে অশ্লীলতা। পালা সম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে (১৯০৭-) যাত্রার অতি দীর্ঘ বক্তৃতা, প্রচুর গান, অপ্রয়োজনীয় গান, কোরাস, ডুয়েট গান ও ভাঁড়ামি দেখে বিরক্ত হন। তিনি বলেন, 'কমিক চরিত্র বা দ্বৈত সংগীতের সঙ্গে পালার গতির কোনো সম্পর্ক ছিল না। পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল অদ্ভুত। রাজা-প্রজা সকলে এক ধরনের পোশাক পরত। সবার মুখে এক জাতীয় ভাষা বসানো হতো। ব্রজেন্দ্রকুমার দে যাত্রার ভাষা ও সংলাপ রচনার পরিবর্তন আনার উদ্যোগ দেন। তিনি তার 'চাঁদের মেয়ে' (১৯৩৬) যাত্রা পালায় দীর্ঘ সংলাপ ব্যবহার না করে ছোট ছোট সংলাপ লেখেন। ছোট ছোট সংলাপের পালা মঞ্চস্থ করতে গিয়ে তিনি দেখতে পান মঞ্চের দুই-একদিকের দর্শকরা খেই হারিয়ে ফেলছে। সংলাপ ফেনিয়ে না বললে শ্রোতাদের সঙ্গে সংলাপের সংযোগ স্থাপিত হয় না। লিঙ্ক কেটে যায়। ছোট সংলাপের পালার সুরের প্রাধান্য কমে যায়। অভিনয় ক্রমাগত স্বাভাবিক হয়ে আসে। এর ফলে মহিলা শিল্পীরা দলে দলে এসে যাত্রায় ভর্তি হয়। একই সঙ্গে নারী চরিত্রে পুরুষ অভিনেতার সংখ্যা কমে যায়। যাত্রায় নারী শিল্পী ভর্তি হবার পর অভিনয়ে স্বাভাবিকতা আসে। কিন্তু সমস্যা বাড়ে অন্যত্র। এই পথে ঢুকে পড়ে অশ্লীলতা।

১৯৬৭ সালের পর যাত্রার রথী-মহারথীরা বাচনিক যাত্রাকে আলোর ঝলকানিতে সজ্জিত করেন। কুশীলব ও দর্শকদের সামনে তুলে ধরেন মাইক্রোফোন, টেপরেকর্ডার, লাউড স্পিকার ইত্যাদি। এসব যন্ত্রপাতির সঙ্গে যুক্ত হয় বিদ্যুৎ। এতে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের গলার জোর কমে যায়।

'বিদ্যাসুন্দর' যাত্রার অশ্লীলতা দূর করতে মাঠে নামেন মতি রায় (১৮৭২)। তার পথ অনুসরণ করেন অহিভূষণ ভট্টাচার্য, কেশব বন্দ্যোপাধ্যায়, অঘোর কাব্যতীর্থ, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, কুঞ্জ বিহারী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। কিন্তু তাদের আন্দোলনে কাজ হয়নি। পেশাদার যাত্রা দলগুলোতে ঢুকে যায় খিস্তি-খেউড় আর নগ্ন নৃত্য। নায়িকারা যাত্রা মঞ্চে ষোল-সতেরো বার পোশাক বদল করে। মঞ্চে দেখানো হয় ধর্ষণদৃশ্য। একই সঙ্গে যাত্রার সময়ের বিস্তার কমে আসে। আট ঘন্টার যাত্রা তিন ঘন্টা হয়ে যায়। এতে যাত্রার মূল চরিত্র হারিয়ে যায়। যাত্রা লোকশিল্পের চেহারা বদল করে নাটকের চেহারা গ্রহণ করে। একই সঙ্গে যাত্রার বিবেকের মৃত্য ঘটে।

বিবেক মঞ্চে প্রবেশ করলেই দর্শকরা কান খাড়া করে বিবেকের গানের বাণী এবং সুরের কারুকাজ হৃদয়ঙ্গম করত। বিবেক ছিল যাত্রার ক্লাইমেক্স। এই চরিত্রটি বিলুপ্ত করে যাত্রায় ঢুকানো হয় উদাস বাউলের কণ্ঠে মোহ ভঙ্গ করা গান। কিন্তু তা দর্শকদের মন কাড়তে পারেনি।

ঊনিশ শতকে দর্শকদের মূল আকর্ষণ ছিল গীত প্রধান পৌরাণিক পালা। এসব যাত্রায় অভিনয় করেন গোবিন্দ অধিকারী (১৭৯৮-১৮৭০), কৃতঞ্চকমল মুখোপাধ্যায় (১৮১০-১৮৮), গোপালচন্দ্র দাস (১৮১৯-১৯৫৯) ও নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় (১৮৪১-১৯১২)। বিশ শতকের পালায় উঠে আসে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা-যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী। বিশ শতকের গোড়ায় অবিভক্ত বাংলার প্রধান পালাকার ছিলেন মুকুন্দ দাস (১৮৭৬-১৯৩৪)। তার যাত্রা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। ব্রিটিশ সরকার তার যাত্রা পালা নিষিদ্ধ করে। তার অভিনীত ও গীত যাত্রাপালার নাম ছিল 'স্বদেশী যাত্রা'। ১৯০৫ সালে তিনি রচনা করেন যাত্রাপালা 'মাতৃপূজা'। 'মাতৃপূজা'র প্রথম মঞ্চায়ন হয় বরিশাল জেলার বানারীপাড়া নবগ্রাম, ভোলানাথ গুহঠাকুরের বাড়িতে। ১৯০৬ সালে এক বছর পরেই তার প্রতি শুরু হয় ব্রিটিশ সরকারের দমন-পীড়ন। ১৯০৬ সালে মুকুন্দ দাস যাত্রা পালার উপর ৩৬টি ইংজাংশন পান। ১৯০৮ সালে মুকুন্দ দাসকে তার দলবলসহ বরিশাল জেলার উত্তর শাহবাজপুর দাদপুরের কাছে মেঘনা নদীর মধ্যে একটি নৌকা থেকে পুলিশ গ্রেফতার করে। যাত্রা পালা মঞ্চায়ন করার অপরাধে মুকুন্দ দাসের তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং তিনশ' টাকা জরিমানা, অনাদয়ে আরো এক বছরের কারাদণ্ড হয়। 'মাতৃপূজা'র পর মুকুন্দ দাস গিরিশচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক রচিত 'বলিদান' নাটকের যাত্রা রূপ দেন 'সমাজ' (১৯১১-১২) নামে। এই যাত্রায় কুলীন প্রথা, যৌতুক প্রথা ও পণপ্রথার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ বক্তব্য উপস্থাপিত হয়। বিশ শতকের শুরুতে যাত্রাপালা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। যাত্রায় উচ্চারিত হয় দু:শাসন ও অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। পরবর্তী সময়ে এর ব্যাপক অবক্ষয় ঘটে। তা সত্ত্বেও পাকিস্তান আমলে যাত্রার অভিযাত্রা অব্যাহত ছিল। ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে উল্লেখযোগ্য যাত্রা দলগুলোর মধ্যে ছিল মানিকগঞ্জের

'অন্নপূর্ণ অপেরা' (১৯৩৩) 'জয়দুর্গা অপেরা' (১৯৪৬), শাহজাদপুরের 'বাসন্তী অপেরা' (১৯৪৪), গোপালগঞ্জের 'রায় কোম্পানী যাত্রা পার্টি' (১৯৪৯), সাতক্ষীরার 'আর্য অপেরা', চট্টগ্রামের 'বাবুল অপেরা' (১৯৫৯) ইত্যাদি।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর এদেশের যাত্রাশিল্পীরা প্রচণ্ড আবেগ নিয়ে যাত্রা শিল্পে অভিনয় শুরু করেন। কিন্তু তা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা পায়নি। ফলে পঙ্কিল পোশাক পরে যাত্রা বাণিজ্যিক পথে অভিগমন শুরু করে। বাংলাদেশের যাত্রাকে উঁচু তলায় টেনে তোলেন অমলেন্দু বিশ্বাস (১৯২৮-১৯৮৭)। তার অভিনীত যাত্রার নাম ছিল 'ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন', 'মাইকেল মধুসূদন দত্ত,' এডলফ হিটলার', 'সিরাজ-উ-দৌলা', 'অচল পয়সা' ইত্যাদি। ১৯৭৯ ও ১৯৮০ সালে শিল্পকলা একাডেমী আয়োজিত জাতীয় যাত্রা উৎসবে 'মাইকেল মধুসূদন দত্ত' ও 'জানোয়ার' পালার নাম ভূমিকায় অভিনয় করে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার পান অমলেন্দু বিশ্বাস। সে সময় তিনি দু:খ করে বলেন, 'বাংলাদেশে পালাকারের বড় অভাব। পশ্চিমবঙ্গের পালাকারদের রচিত পালানাটক আনিয়ে অভিনয় করাতে হয়।'

বাংলাদেশের যাত্রাকে বিপর্যস্ত করেছে নগর কেন্দ্রিক জীবনধারা। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের পর গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন অনেক নাট্যকারের জন্ম দিয়েছে; কিন্তু পালাকারের জন্ম দেয়নি। ফলে অতীতের আবর্তে ঘুরপাক খেতে খেতে যাত্রা দর্শক বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

লোকবাদ্যযন্ত্র

প্রাচীনকালেও বাদ্যযন্ত্র ছিল। বৈদিক যুগে ছিল দুন্দুভি, বেণু, বীণা ইত্যাদি। সিন্ধু সভ্যতায় মৃদঙ্গের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। লোকসাহিত্যে বহু বাদ্যযন্ত্রের বিবরণ পাওয়া যায়। বাদ্যযন্ত্রগুলোর মধ্যে তারের বাদ্যযন্ত্রই ছিল বেশি। চীনা পর্যটক বাংলাদেশকে সংগীত ও নৃত্যের দেশ হিসাবে আখ্যায়িত করেন। বীণা বাদ্যযন্ত্রটি অতি প্রাচীন। খ্রিস্টপূর্ব চার হাজার বছর পূর্বে সিন্ধু সভ্যতায় বীণার ব্যবহার ছিল। এর ধরন ছিল অনেকটা ধনুকের মতো। তাই একে 'ধনুযন্ত্র' বলা হতো। বীণা তৈরির উপকরণ বাড়ির আশেপাশেই পাওয়া যেত। এটা তৈরির জন্য প্রয়োজন হতো কয়েক খণ্ড কাঠ, লাউ, বাঁশ, সুতো ও হাড়। আধুনিক কালে বাঁশের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় কাঠ। বিচিত্র রকমের বীণার মধ্যে তানপুরা একটি। যন্ত্রটি উচ্চাঙ্গ সংগীত গাওয়ার সময় ব্যবহৃত হয়। 'সংগীতসার' গ্রন্থে তানপুরাকে অতি প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। নারদমুনি যেখানেই যেতেন, তার সঙ্গে থাকত তানপুরা।

মধ্যযুগে প্রচলিত বীণাগুলোর মধ্যে পিনাকি, বল্লকি, রুদ্রবীণা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল। পিনাকি বীণার আকৃতি ধনুকের মতো। ছড় দিয়ে এটি বাজানো হয়। এদেশের সাধারণ মানুষ শুধু বাদ্যযন্ত্রের সুরের প্রতিই নজর দেয়নি, বাদ্যযন্ত্রের সৌন্দর্যের প্রতিও নজর দিয়েছে। প্রতিটি বাদ্যযন্ত্রেই রয়েছে কারুশিল্পীদের মননের স্পর্শ। এ জন্যই কারুশিল্পীর রুচিকে সম্মান করতে গিয়েই হয়ত বীণার নাম রাখা হয়েছে ময়ূরবীণা। ময়ূরবীণা কাঠের তৈরি। এর নিচের অংশ ময়ূরের মতো। ময়ূরবীণার ষোলটি পিতলের পর্দা থাকে। ছড় দিয়ে ময়ূরবীণা বাজানো হয়। সাধারণ মানুষ লাউকে কচ্ছপের পিঠের আকৃতির মতো করে তৈরি করেছে কচ্ছপীবীণা। চলতি কথায় একে কাছুয়া সেতারও বলা হয়। প্রথম দিকে এর তারের সংখ্যা ছিল তিনটি। পরবর্তীকালে তারের সংখ্যা বাড়িয়ে করা হয় সাতটি। পারস্য দেশের সংগীতবিদ আমীর খসরু এটি আবিষ্কার করেন।

বাদ্যযন্ত্র মানুষের অমূল্য সৃষ্টি। লোকশিল্পী এবং সংগীতাবিদরা মানুষের জীবনকে আনন্দময় করে তোলার জন্য এসব বাদ্যযন্ত্র আবিষ্কার করেন। তাদের এই সৃষ্টি কোনো নির্দিষ্ট স্থানে এসে থেমে যায়নি। ধ্বনি ও সুরে বৈচিত্র্য আনার জন্যই নতুন নতুন বাদ্যযন্ত্র আবিষ্কার করা হয়েছে। এ কারণে সুর সৃষ্টির জগত হয়ে উঠেছে বৈচিত্র্যপূর্ণ। কোনো কোনো বাদ্যযন্ত্র নতুন আবিষ্কৃত হয়েছে। আবার অনেকগুলো বাদ্যযন্ত্র নিজের আসনে টিকে রয়েছে। একসময় এদেশে মাঠে-ঘাটে বাঁশি শোনা যেত। রাখাল ছেলের

সঙ্গে থাকত বাঁশি। কর্মক্লান্ত কৃষক গাছের ছায়ায় বসে নিজের আনন্দে বাঁশি বাজিয়ে গান গাইত। কিন্তু সেই বাঁশের বাঁশির কদর কমে গিয়েছে। ঢোল, মৃদঙ্গ ও মাদল নিজের আসনে টিকে রয়েছে। সাপুড়ে নৃত্যের চাহিদা হ্রাস পাবার সঙ্গে সঙ্গে উঠে গেছে তুবড়ি নামের বাদ্যযন্ত্র।

গান, বাজনা ও নাচের সমন্বিত প্রকাশ হচ্ছে সংগীত। কথায় ও সুরে বৈচিত্র্য সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রেরও পরিবর্তন ঘটেছে। শুধু তারের বাদ্যযন্ত্র নয়, আরেক প্রকার বাদ্যযন্ত্র আছে, যেগুলো চামড়া দ্বারা প্রস্তুত। এগুলোর মধ্যে রয়েছে দুন্দুভি, মৃদঙ্গ, মাদল, ঢাক, ঢোল, ডমরু, কাড়া, তবলা, ভেরী, টমক ইত্যাদি। অনেকগুলো বাদ্যযন্ত্র নিচু সম্প্রদায়ের শিল্পীরা ব্যবহার করে। অনেকগুলো বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে অভিজাতরা। পরবর্তী সময়ে নিচু সমাজের বাদ্যযন্ত্রও উচু সমাজ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে।

চামড়ার তৈরি বাদ্যযন্ত্রকে আনদ্ধ বলা হয়ে থাকে। যেমন- মাদল। এটি একটি গ্রামীণ বাদ্যযন্ত্র। যন্ত্রটি গ্রামীণ উৎসবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সাঁওতালদের মধ্যে এটি খুবই জনপ্রিয় বাদ্যযন্ত্র। আরেক গ্রামীণ বাদ্যযন্ত্রের নাম ডমরু। প্রাচীনকালে ডোম সম্প্রদায় এই বাদ্যযন্ত্রটি ব্যবহার করত। যারা সাপ কিংবা বানরের খেলা দেখাত, তাদের মধ্যে যন্ত্রটির ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল। প্রাচীন বাংলার ভাস্কর্যে দেখা যায় দণ্ড দ্বারা যন্ত্রটি বাজানো হচ্ছে।

ঢাক, জয়ঢাক, বীরঢাক ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র প্রাচীনকালেও প্রচলিত ছিল। এগুলো হচ্ছে চামড়ার তৈরি বাদ্যযন্ত্র অর্থাৎ আনদ্ধ। ঢাক বাদ্যযন্ত্রটির খোল তৈরি করা হয় কাঠ দিয়ে। এর দুদিকে দুটি মুখ থাকে। দুটি মুখ চামড়া দিয়ে আবৃত। যন্ত্রটি দু'হাতে দুটি কাঠি দিয়ে বাজানো হয়। পূর্জা-অর্চনা, উৎসব ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের জন্য ঢাক একটি গুরুত্বপূর্ণ বাদ্যযন্ত্র। বড় আকারের ঢাককে জয়ঢাক বলা হয়। ঢাককে দৃষ্টি নন্দন করে সাজানোর জন্য পাখির পালক দিয়ে সাজানো হয়। ঢাক থেকে ছোট আকারের আরেকটি বাদ্যযন্ত্রের নাম ঢোল। ছোট আকারের ঢোলকে ঢোলক বলে। ঢোল বাদ্যযন্ত্রটি যাত্রা ও নাটকের ঐকতান সৃষ্টির জন্য একটি অতি প্রয়োজনীয় বাদ্যযন্ত্র। গজল ও কাওয়ালীর সঙ্গে এটি ব্যবহৃত হয়।

পাখোয়াজ একটি আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্র। প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র মৃদঙ্গের অনুসরণে এটি তৈরি। 'পাখোয়াজ' শব্দের অর্থ পবিত্র ধ্বনি। এর আওয়াজ খুব মধুর ও গম্ভীর। যন্ত্র নির্মাণ করতে লাগে গামারি, রক্ত চন্দন কিংবা নিমের কাঠ। এর দৈর্ঘ্য দেড় থেকে পৌনে দুই হাত। পাখোয়াজের দুই মুখ চামড়া দিয়ে আবৃত। যন্ত্রটি সাধারণত রবাব, সুরবাহার, ধ্রুপদ ও ধামারের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়।

কাড়া নামে একটি চমৎকার বাদ্যযন্ত্র সামরিক ও মাঙ্গলিক কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর একদিক চামড়া দিয়ে আচ্ছাদিত। কাড়ার আকৃতি অনেকটা বাটির মতো,

গলায় ঝুলিয়ে কাঠির সাহায্যে যন্ত্রটি বাজানো হয়। টিকারা বাদ্যযন্ত্রটি কাড়া অপেক্ষা ক্ষুদ্র। টিকারা সাধারণ সানাই ও নাকারার অনুগামী যন্ত্র হিসাবে বাজানো হয়। বৃহৎ আকারের টিকারা হাতি বা উটের পিঠে স্থাপন করে বাজানো হয়। টিকারার মতো আরেকটি আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্র হচ্ছে দামামা। আগের দিনে সমর সঙ্গীতের সঙ্গে ব্যবহৃত হতো, এখন মাঙ্গলিক উৎসবে ব্যবহৃত হয়।

এদেশের অনেক বাদ্যযন্ত্রই ধাতু দ্বারা নির্মত। ধাতু নির্মিত বাদ্যযন্ত্রের নাম ঘন বাদ্যযন্ত্র। যে সব ধাতু দিয়ে ঘন বাদ্যযন্ত্র নির্মিত হয়, সেসব ধাতুর মধ্যে রয়েছে তামা, কাঁসা, লোহা প্রভৃতি। প্রাচীনকালেও ধাতব বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ছিল। কাঁসা দিয়ে নির্মিত একটি যন্ত্রের নাম কাঁসা। প্রাচীনকালে এই বাদ্য যন্ত্রের ব্যবহার ছিল। কাঁসা কাঠি দিয়ে বাজানো হয়। এটি একটি মাঙ্গলিক বাদ্যযন্ত্র।

প্রাচীনকালে পূর্জা-অর্চনায় ঘন্টার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। ঘন্টা জাতীয় বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে রয়েছে ঘন্টা, ক্ষুদ্র ঘন্টিকা, জয়ঘন্টা ইত্যাদি। কাঁসা, ভরণ, পিতল অথবা লোহা দিয়ে এ ধরনের বাদ্যযন্ত্র নির্মাণ করা হয়। ঘন্টার নাম অনুসারে ধ্বনিরও পার্থক্য রয়েছে। গম্বুজাকৃতির ঘন্টা বাজানোর জন্য একটি শলাকা থাকে। শলাকার সম্মুখভাগে থাকে একটি গোলাকার পিণ্ড। ক্ষুদ্র ঘন্টার মাঝখানে থাকে ধাতু নির্মিত গোলক। মন্দিরা কাঁসার দ্বারা নির্মিত একটি ঘন বাদ্যযন্ত্র । দুটি ছোট কাঁসার বাটি পরস্পরকে আঘাত দিয়ে মন্দিরা বাজানো হয়। তাল, লয় ও ছন্দ নিরুপনে মন্দিরা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। লৌহ নির্মিত একটি বাদ্যযন্ত্রের নাম হচ্ছে খরতাল। এটি প্রধানত ঐকতানে ব্যবহৃত হয়। ভজনগীতে এককভাবে খরতালের ব্যবহার প্রচলিত রয়েছে। আধ ফুট লম্বা দু'টো পৃথক লোহার দণ্ড দিয়ে যন্ত্রটি তৈরি। বাদক দণ্ড দুটি এক হাতের মুঠিতে ধরে পরস্পরের আঘাতে সুর সৃষ্টি করে। এর ধ্বনিতে রয়েছে আশ্চর্য মাদকতা।

বাংলাদেশে ফুৎকার বাদ্যযন্ত্রের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। এ ধরনের যন্ত্রের মধ্যে রয়েছে শঙ্খ, গোমুখ শঙ্খ, শিঙ্গা, রণশিঙ্গা, কাহাল, উপাঙ্গ, তুরী, ভেরী, বাঁশি, সানাই, নৈরী, পাব ইত্যাদি। এগুলোর গড়ন অনুসারে ধ্বনির পার্থক্য রয়েছে। প্রাচীনকালে যুদ্ধক্ষেত্রে শঙ্খের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। শঙ্খকে বলা হয় ভারতীয় ট্রামপেট। প্রাচীনকালে শঙ্খের ছিদ্রস্থলে একটি স্বর্ণ বা রৌপ্য নির্মিত নল মোম দিয়ে আটকিয়ে দেয়া হতো। কিন্তু বর্তমানে শঙ্খ ফুৎকার যন্ত্রে স্বর্ণ বা রৌপ্যের ব্যবহার প্রচলিত নেই। হিন্দুদের পূজা-অর্চনা ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে শঙ্খ ব্যবহৃত হয়।

বাঁশি জাতীয় একটি ফুৎকার যন্ত্রের নাম ভেরী। অনেকগুলো ক্ষুদ্র নলের সমন্বয়ে গঠিত বাদ্যযন্ত্রের নাম ভেরী। সাধারণত একটি নল আরেকটি নলের মধ্যে প্রবিষ্ট থাকে। ভেরী পিতলে নির্মিত। প্রাচীনকালে এটি রণক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতো। বর্তমানে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়।

প্রাক-বৈদিক ও বৈদিক যুগে এই উপমহাদেশে চার ধরনের বাদ্যযন্ত্রই ব্যবহৃত হতো। সিন্ধু সভ্যতায় চামড়ার বাদ্যযন্ত্র মৃদঙ্গ, তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্র বীণা, ফুৎকার বাদ্যযন্ত্র

বাঁশি এবং ধাতুর বাদ্যযন্ত্র করতালের নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। বৈদিক যুগে বাদ্যযন্ত্র দুন্দুভি, মৃদঙ্গ, ডমরু ও বীণার নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। রামায়ণ ও মহাভারতে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ রয়েছে। মধ্যযুগে মোগল আমলে ভারতে সংগীতের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। সম্রাট আকবর ছিলেন সংগীত-প্রিয়। তার দররার অলঙ্কৃত করেন মিয়া তানসেন।

বাংলা ভাষায় রচিত প্রাচীন চর্যাপদ ছিল এক ধরনের সহজিয়া সংগীত। প্রতিটি চর্যাপদের আগে গীতিকার রাগের নাম উল্লেখ করেছেন। একটি চর্যাগানে লেখা হয়েছে, 'অনাহত ডমরু বাজে বীরনাদে'। একই পদে নূপুরের কথাও উল্লেখ আছে। চর্যাপদে সেকালের নাচ গানের বর্ণনা আছে। আছে বীণা বাদ্যযন্ত্রের কথা। একটি চর্যাগানে বলা হয়েছে, 'সর্বব্যাপ্ত হয়ে ওঠে বত্রিশ তারের ধ্বনি'। আরেকটি চর্যাগানে আছে, 'আশ্চর্য করুণার সুরে ডুগডুগি বাজছে'।

চর্যাগানের মধ্যে ফুটে উঠেছে তৎকালীন মানুষের নৃত্যগীতির কথা। চর্যাগানে আছে 'বজ্রধর নাচেন, দেবী গান গীত।' সে সময় নাচ ও গানের সঙ্গে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হতো। চর্যাপদে রয়েছে জীবনের দুই পিঠ-সাধারণ ও সাংকেতিক। লোকজীবনের বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনায় চর্যার গানগুলো মুখর হয়ে উঠেছে। সেখানে যে মানুষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তারা তুলা ধোনে, নৌকা চালায়, নৌকা তৈরি করে, পশু-পাখি শিকার করে, দই বেচে, মাছ ধরে। তারা ডোম, গুরু-গোঁসাই, শবব-শবরী, নৃত্যশিল্পী। এ সব মানুষ ঘাত-সংঘাতের মধ্যেও উপভোগ করেছে নাচ-গান-বাদন। ডমরু ও বীণার সুরে মুখর হয়েছে তাদের অন্তরলোক।

লোকসমাজের আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে চর্যাপদে। কাহ্নপার একটি চর্যাগানে চমৎকার বরযাত্রার বর্ণনা আছে। এই পদচিত্রে বলা হয়েছে, 'ভব ও নির্বাণ হচ্ছে পটহ ও মাদল।' সেখানে আরো আছে দুন্দুভি জয়ধ্বনি তুলে কাহ্নপা বিয়ে করতে চলছে। তৎকালীন সমাজে আনন্দ-উৎসবে অনেক রকম বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হতো। মধ্যযুগের পদাবলীগুলোতে চির ব্যাপ্ত হয়ে উঠেছে বাঁশির সুর। তাই প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙালির বাদ্যযন্ত্রগুলো একান্তভাবেই তাদের নিজস্ব সম্পদ। বাদ্যযন্ত্রগুলো কারো কাছ থেকে ধার করা ছিল না। সে সব বাদ্যযন্ত্র সময়ের সীমা অতিক্রম করে চিরকালের বাদ্যযন্ত্র হয়ে উঠেছে।

এদেশের অপরূপ প্রকৃতি ও নদ-নদী মানুষের চিন্তা ও প্রেমকে বিচিত্রভাবে আন্দোলিত করেছে। মানুষ নদীকে ভালোবেসে নদীর নাম রেখেছে মধুমতি কিংবা দুধ কুমার। মাটির স্পর্শে মানুষ হয়েছে মাটির মানুষ। নিতান্ত সহজ-সরল তাদের জীবন। এদেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থা মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলোকে সুপ্রকাশের সুযোগ দিয়েছে।

লোকশিল্পীরা ভরা বর্ষায় কণ্ঠে ধারণ করে ভাটিয়ালী গান। গো-চারণ মাঠে রাখাল তার মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য বাঁশিতে তোলে মোহ মুগ্ধকর সুর। এদেশের মানুষ

দ্বি-প্রহরে মন্দিরা বাজিয়ে নতুন ঋতুকে স্বাগত জানায়। জোছনা রাতে একতারা বাজিয়ে ভাবুক তার মনের ভাব প্রকাশ করে। এদেশের মানুষের সহজ-সরল প্রকাশ ঘটে তাদের লোক-সঙ্গীতে। লোক-সঙ্গীতের সঙ্গে ব্যবহৃত হয় বিচিত্র রকমের লোকবাদ্যযন্ত্র। এসব যন্ত্রের মধ্যে একতারা ও দোতারা খুবই জনপ্রিয়। লাউ-এর খোল এবং বাঁশের দণ্ডের সাহায্যে একতারা তৈরি করা হয়। লোকশিল্পীরা ভাটিয়ালী ও বাউল গানে ব্যবহার করে একতারা। উৎসব ও মেলায় একতারা বাজিয়ে গান গায়।

এদেশের লোকশিল্পীরা একটি তারের উপর ভিত্তি করে বিচিত্র ধরনের সুর রচনা করে। বিদেশীরা দেখে অবাক হয়। কাঠের খোলের উপর চামড়ার ছাউনি দিয়ে চারটি তার বসিয়ে বানানো হয় দোতারা। দোতারা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে সরোদ। সরোদের মাধ্যমে লোক সঙ্গীত ও রাগ সঙ্গীত-দুটিই পরিবেশন করা যায়। চর্যাপূর্ব কালেও বাংলায় রাগ সঙ্গীতের প্রচলন ছিল। লোকসঙ্গীত ও রাগ সঙ্গীতের পারস্পরিক প্রভাব ধরা পড়ে যাত্রা গানের বিবেকের কণ্ঠে। যাত্রাগানের বিবেকের কণ্ঠ বিশুদ্ধ রাগে সৃষ্ট।

বাংলাদেশ মূলত সমতল ভূমি। তবে দক্ষিণ-পূর্বে কিছুটা পার্বত্য এলাকা রয়েছে। পার্বত্য ও নিম্ন পাহাড়িয়া অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে ময়মনসিংহ জেলার গারো পাহাড়, সিলেটের খাসিয়া ও জয়ন্তিকা পাহাড়, চট্টগ্রামের লুসাই পাহাড় এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের পার্বত্য এলাকা ও নিম্ন পাহাড়িয়া অঞ্চল। এসব অঞ্চলে বসবাসরত উপজাতির মধ্যে রয়েছে চাকমা, সাঁওতাল, মণিপুরী, গারো, মোরং, খাসিয়া, মারমা, রাখাইন, মুণ্ডা, লাউয়া, হাজং, রাজবংশী, ওরাওঁ, তঞ্চঙ্গ্যা, সেন্দুজ খুমীসহ আরো বিভিন্ন উপজাতি। উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সমতল ভূমির মানুষের পার্থক্য রয়েছে। অনেকগুলো উপজাতিই নিজেদের সংস্কৃতির মৌলিকত্ব অক্ষুণ্ন রেখেছে। আবার অনেক উপজাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালি সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটেছে। এই মিশ্রণের ফলে তাদের সংস্কৃতির সমৃদ্ধ হয়েছে। কিন্তু মৌলিকত্ব হারায়নি। তাদের লোকযন্ত্রগুলোর নির্মাণ ও বাদন শৈলীর মধ্যে রয়েছে মোহনীয় আবেশ।

চাকমাদের প্রধান বাদ্যযন্ত্র হচ্ছে বাঁশি। তরুণ-তরুণীরা এ বাঁশি বাজাতে জানে। চাকমা উপজাতির মধ্যে 'খানগারাং' নামে একটি বাঁশের বাদ্যযন্ত্র আছে। এই যন্ত্রটি বেশ জটিল। তা শুধু মেয়েরাই বাজাতে জানে। খাসিয়া উপজাতির মধ্যে নৃত্যে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে রয়েছে ঢোল, গিটার, বাঁশি ও বেহালা। খাসিয়া নৃত্যগীতের মধ্যে বাঁশির ব্যবহার সর্বাপেক্ষা বেশি। এমনকি শবদাহ করার সময়ও তাদের মধ্যে বাঁশি বাজানোর রীতি প্রচলিত রয়েছে। এ কারণে খাসিয়া সমাজে বংশীবাদকরা অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি। মণিপুরীদের নৃত্যগীতে রয়েছে একটি মৌলিক সৃজনী শক্তি। এ কারণে বাংলাদেশ ও ভারত মণিপুরী নৃত্যের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। মণিপুরী নৃত্যের সংগীতবাহী বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে রয়েছে মৃদঙ্গ, মন্দিরা, বাঁশি, হারমোনিয়াম, তানপুরা, খঞ্জনী, সেতার, একতারা, ঢোলক, ঘন্টি, মইপঙ ইত্যাদি।

উপজাতীয় বাদ্যযন্ত্র

গভীর অরণ্যে পাতার মর্মর, পাখির কলরব, ঝরনার ঝিরঝির এবং পাহাড়ি নদীর পাগল করা কলধ্বনির মধ্যে সুরের যে মাধুর্য রয়েছে, সেই সুরের মাধুর্যই পাহাড়ি জনগণকে করেছে নৃত্যশিল্পী ও সুরস্রষ্টা। তাদের এসব সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে আদি মানবের মৌলিক উপাদান।

নিষ্প্রাণ পাথরের মধ্যে তারা সৃষ্টি করে সুর। অরণ্যের বাঁশ, কাঠ, লাউ ও জীবজন্তুর চামড়া দিয়ে তারা নির্মাণ করে বিচিত্র ধরনের বাদ্যযন্ত্র। তাদের প্রতিটি বাদ্যযন্ত্রই মৌলিক।

পাহাড়ি জনগণ সাধারণত চার ধরনের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে। এসব বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে রয়েছে বাঁশি, ঢোল ও বেহালা জাতীয় বাদ্যযন্ত্র। তা ছাড়া তারা পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে ধাতু নির্মিত বাদ্যযন্ত্র সংগ্রহ করেও নিজেদের নৃত্যগীতে ব্যবহার করে।

উপজাতীয়দের মধ্যে বাঁশি জাতীয় বাদ্যযন্ত্র খুবই জনপ্রিয় এবং এসব বাঁশির ধর্মীয় তাৎপর্য রয়েছে। বাঁশির নির্মাণ শৈলী অনুসারে নামও পৃথক। ম্রো ও খুমী উপজাতিরা বাঁশিকে বলে 'প্লুং'। তারা এক প্রকার পাহাড়ি লাউ ও বাঁশ দিয়ে এই বাঁশি তৈরি করে। 'প্লুং' বাঁশিটি আধুনিক ব্যান্ডপার্টির ব্যাগপাইপের মতো। এর নির্মাণ প্রক্রিয়া বেশ জটিল। তা সত্ত্বেও ম্রো ও খুমী উপজাতির শিল্পীরা অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে এই বাঁশি নির্মাণ করে। তারা এই বাঁশি ব্যবহার করে গো-হত্যা অনুষ্ঠানে।

ম্রো ও খুমীদের মধ্যে চার ধরনের বাঁশির প্রচলন রয়েছে। নামও বিভিন্ন। বাঁশের পাঁচ নল বিশিষ্ট বাঁশির নাম 'তিনতেং প্লু'। এর নিচের দিকে তিনটি এবং উপরের দিকে দুটি বাঁশের নল রয়েছে। অন্য আরো তিনটি বাঁশির নাম হচ্ছে 'প্লুংকে', 'প্লুংমা ও 'রিনাপ্লুং'। 'প্লুংকে'-এর নিচে দুটি এবং উপরে দুটি; 'পুংমা'-র নিচে দুটি এবং উপরে একটি বাঁশের নল থাকে। 'রিনাপ্লুং'-এ বাঁশের নলের সংখ্যা নয়। এর উপরের দিকে থাকে পাঁচটি নল। নিচের দিকে থাকে চারটি। ম্রো ও খুমীরা তিন ধরনের বাঁশি ব্যবহার করে উৎসবে। তারা বাঁশের নয় নল যুক্ত বাঁশিটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছাড়া অন্য কোনো অনুষ্ঠানে ব্যবহার করে না। তারা বিশ্বাস করে 'রিনাপ্লুং' বাঁশি তাদের রোগ মুক্তির ত্রাণকর্তা। তাই তারা রোগমুক্তির আরাধনায় বাঁশিটি ব্যবহার করে থাকে।

ম্রো ও খুমীরা 'রিনাপ্লুং' বাঁশির সুরকে অতি পবিত্র মনে গ্রহণ করে এবং অত্যন্ত আত্মমগ্ন হয়ে শোনে। তাদের মধ্যে আরেকটি বাঁশের বাঁশি আছে, যার নাম 'তু'। শুকনো লাউয়ের মুখে একটি বাঁশের নল যুক্ত করে এই বাঁশি নির্মাণ করে তারা। আর

খোলের বুক বরাবর আরো দুটি নল মাটির সমান্তরালে দুদিকে সংযুক্ত করা হয়। ম্রো ও খুমীরা কোনো কিছু মানত করলে তারা বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এবং 'তু' বাঁশি বাজায়।

চাকমারা বলে 'বাজি'। এই বাঁশিটি নির্মাণ প্রক্রিয়া সরল। এই বাঁশিতে খোদাই করা কারুকাজ থাকে। চাকমারা তাদের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে 'বাজি' ব্যবহার করে। চাকমা সমাজে 'বাজি' বেশ জনপ্রিয়। ত্রিপুরারা 'শিমুর' নামে বিশেষ ধরনের বাঁশি ব্যবহার করে। 'শিমুর' সাধারণ বাঁশির চেয়ে বেশি লম্বা। ছিদ্র সংখ্যাও বেশি। শিমুরবাদকরা পাহাড়ি সুরে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। ত্রিপুরারা চৈত্র সংক্রান্তি এবং নববর্ষ উদযাপনের সময় 'শিমুর' ব্যবহার করে। চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যারা তাদের বাদ্যযন্ত্র হিসাবে 'শিঙ্গা' নামে বিশেষ ধরনের বাঁশি ব্যবহার করে। 'শিঙ্গার' আওয়াজ অনেকটা বিকট। বান্দরবানের বোমাং রাজার অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয় ধাতুর তৈরি বাঁশি ক্লাওনেট। এটি আধুনিক বাদ্যযন্ত্র হিসাবে বাংলাদেশে ব্যবহৃত হয়। ক্লাওনেট হচ্ছে লোকবাদ্যযন্ত্র।

ঢোল ও ঢোল জাতীয় বাদ্যযন্ত্র উপজাতীয় সমাজে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। ঢোল ছাড়া কোনো জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান কল্পনা করা যায় না। উপজাতি ভেদে ঢোলের নামও ভিন্ন। মারমা সমাজে ছোট আকারের ঢোলকে বলা হয় 'বঙ্গু'। বাদ্যযন্ত্রটি মারমা শিল্পীরা নিজেরাই নির্মাণ করে। এটি কাঠ ও বন্য প্রাণীর চামড়া দিয়ে প্রস্তুত। মারমারা তাদের অনুষ্ঠানে একসঙ্গে কয়েকটি 'বঙ্গু' পাশাপাশি বাজিয়ে থাকে। 'বঙ্গু' আকৃতির চেয়ে বড় ঢোলকে বলা হয় পেহ্। এটি কাঠ ও চামড়ার তৈরি। উসুইরা গামারি কাঠ ও বন্য জন্তুর চামড়া দিয়ে তৈরি করে 'খাইং' নামে বিশেষ ধরনের ঢোল। এটি সাধারণ ঢোলের মতোই।

চাকমা, মারমা ও চাকদের 'ক্যাং'-এ ব্যবহৃত হয় অষ্টধাতুর তৈরি 'গঙ্গ' বা 'মঙ্গ' বাদ্যযন্ত্র। কোনো কোনো উপজাতি এটিকে 'দারখোয়াং' বলে। উপজাতীয় সমাজে ধাতু নির্মিত ঘন বাদ্যযন্ত্রের সংখ্যা কম। তবে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এর একটি বিশেষ তৎপর্য রয়েছে। ম্রো ও খুমীরা গো-হত্যা অনুষ্ঠানে 'গঙ্গ' ব্যবহার করে। লুসাইরা নরমণ্ড শিকার নৃত্যে এবং পাংখোয়ারা শিকার ও যুদ্ধ-নৃত্যে 'গঙ্গ' ব্যবহার করে। 'গঙ্গ' একটি গোলাকার ঘন্টা জাতীয় বাদ্যযন্ত্র। 'গঙ্গ' বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যখান কিছুটা উঁচু থাকে। একটি কাঠের দণ্ড দিয়ে সজোরে আঘাত করে 'গঙ্গ' বাজানো হয়।

উপজাতীয়রা বিভিন্ন ধরনের তারের বাদ্যযন্ত্র করে। উপজাতীয়রা উদাস বাউলের কণ্ঠে গান গায় না। তাদের সকল ধরনের নৃত্যগীতে এক ধরনের উদ্দামতা থাকে। তাদের প্রতিটি গীত ও নৃত্যে রয়েছে ধর্মীয় অনুভূতির স্পর্শ। তাই তাদের নাচ-গান-বাদনের মধ্যে রয়েছে সমাজের অন্তর্নিহিত বক্তব্য। তারা বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরিবেশন করে নৃত্যগীত। এসব অনুষ্ঠানকে আরো বেশি উন্মত্ত করে তোলার জন্য তারা বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে।

উপজাতীয় বাদ্যযন্ত্র

ম্রো ও খুমী উপজাতিরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে একতারা ব্যবহার করে থাকে। লাউয়ের খোল কিংবা নারকেলের মালা দিয়ে তারা একতারা তৈরি করে। তাদের একতারায় রয়েছে কষ্ট সহিষ্ণু জীবনের পাহাড়ি সুর। উসুই উপজাতিরা ব্যবহার করে 'সেদা' নামে একটি বাদ্যযন্ত্র। এটার আকার ঘুঘু পাখির বাসার মতো। কিন্তু লম্বায় দুই-তিন হাত। এক খণ্ড চওড়া কাঠকে খোদাই করে 'সেদা' নির্মাণ করা হয়। এতে তিনটি তার থাকে। বাদ্যযন্ত্রটির বেশ ওজন। এর বাজানোর পদ্ধতি গিটারের মতো। কিন্তু তারের ধ্বনিতে ভিন্ন সুর রয়েছে। উসুইরা ব্যবহার করে 'চংপ্রেই' নামে একটি বাদ্যযন্ত্র। এটিও কাঠ দ্বারা নির্মিত এবং তিনটি তার সংযুক্ত। মারমারা 'খ্রে খ্রং' নামে একটি বাদ্যযন্ত্র। ব্যবহার করে। এটি একটি ছোট বাদ্যযন্ত্র। বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তৈরি। ত্রিপুরারা এই বাদ্যযন্ত্রটিকে বলে 'দাঙ্‌মুঙ্'। চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যারা এই বাদ্যযন্ত্রটি ব্যবহার করে থাকে। বর্তমানে এটি লোহা দিয়েও নির্মিত হয়। লোহা নির্মিত বাদ্যযন্ত্রটির নাম 'খেংখরং। উপজাতিরা অউপজাতীয় কারিগরদের মাধ্যমে এটি তৈরি করিয়ে নেয়। মারমারা 'বৈয়াজ' নামে একটি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে। যন্ত্রটি নিজস্ব কারুশিল্পীরা তৈরি করে। বাঁশ দ্বারা নির্মিত এই বাদ্যযন্ত্রটি দেখতে বেহালার মতো। উপজাতি ভেদে বাদ্যযন্ত্রটির নাম ভিন্ন। এই বাদ্যযন্ত্রটিকে চাকমারা 'বেলা' এবং ত্রিপুরারা 'বে-আনা' বলে।

উল্কি

ফ্রান্সের একটি নদীর নাম ভেরেজ। তার তীরে দোদোঁ নামে একটি অখ্যাত অঞ্চল। এই অঞ্চলে মাটি খুঁড়ে পাওয়া গিয়েছে প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার নিদর্শন। স্থানীয় নাম অনুসারে এই সভ্যতার নাম দেয়া হয়েছে ক্রো ম্যাঁনো। এর অর্থ বিশাল কন্দর। কন্দর অর্থ হচ্ছে পাহাড়ের গুহা।

কারা ক্রো ম্যাঁনো-র অধিবাসী ছিল, তা নিয়ে নানা বিতর্ক রয়েছে। তাদের সঙ্গে মিল রয়েছে প্রাচীন নরগোষ্ঠী অ্যাঙ্গলো-স্যাকসনদের সঙ্গে। তাদের গায়ের রং ছিল ফর্সা। তারা প্রসাধন চর্চায় ছিল বিস্ময়কর গুণের অধিকারী। তাদের সভ্যতার নিদর্শন হিসাবে পাওয়া গিয়েছে হাড়ের মূর্তি এবং অঙ্গাভরণ।

বিশ্বের অন্যান্য স্থানেও প্রাগৈতিহাসিক যুগের গুহা মানবদের আঁকা ঘোড়া, হরিণ ও বাইসনের ছবি পাওয়া গিয়েছে। গুহা মানবেরা তাদের বাসগুহার মধ্যে শুধু জীবজন্তুর ছবিই আঁকেনি, তারা অন্ধকার গুহার মধ্যেও ও ভাবনার উত্তেজনা প্রকাশ করেছে বিভিন্ন প্রতীকের মাধ্যমে। তারা ভয় করত অলৌকিক প্রকৃতি, অপঘাত, রোগ-শোক ও জরা-মৃত্যকে। তারা গৈরিক মাটি দিয়ে মৃতদেহের উপর লাল রঙে দিয়ে এঁকে দিয়েছে প্রাণের চিহ্ন। এভাবেই গুহাবাসী মানুষের মনে সৃষ্টি হয়েছে প্রসাধন চর্চার।

প্রাগৈতিহাসিক কালে হয়ত কোনো মেয়ে খাবার জন্য শামুক, ঝিনুক কিংবা গুগলি কুড়াচ্ছে। সে সময় একটা পুরুষ তাকে দেখে ফেলেছে। আর তার মাথায় হাড়ের ডাণ্ডা দিয়ে আঘাত করেছে পুরুষটি। আঘাতের চোটে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে মেয়েটি। কপাল ফেটে রক্ত ঝরেছে। কিন্তু পুরুষটির মনে কোনো সহানুভূতি জাগেনি। বরং তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে গিয়েছে নিজের আস্তানায়। এরপর নাকে বেতের আংটা পরিয়ে বেঁধে রেখেছে গাছের সঙ্গে। মেয়েটি পালাবার চেষ্টা করলে পায়ে পরিয়ে দিয়েছে বেতের বেড়ি। কানে পরিয়ে দিয়েছে কড়া। এভাবেই মেয়েটি বাঁধা পড়ে গিয়েছে পুরুষটির কাছে। হয়ত দুজনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আর কপালের রক্ত হয়েছে সিঁদুর। পায়ের রক্ত হয়েছে আলতা। তখন মেয়েরা থাকত মন্ত্রসুরক্ষিত গৃহে। পুরুষরা বের হতো শিকারে। এভাবেই তাদের মনে সৃষ্টি হয়েছে ভয় ও আত্মার ধারণা। আত্মায় প্রবেশ করেছে বিস্ময়কর ঈশ্বরচিন্তা। তারা ঈশ্বরকে তুষ্ট করার জন্য রঙে রঙিন করেছে দেহ।

শিকারী পর্যায়ে প্রাচীন মিশরীয়রা আঁকত উল্কি। বনজ ফলের বিচি থেকে তেল নিংড়ে নিয়ে চামড়া রক্ষা করতে গায়ে মাখত তেল। Pre-dynasty যুগে মিশরের মানুষ

চোখের পাতায় কাজল মাখত। রাজবংশের যুগে মিশরের প্রধান রং ছিল সবুজ আর কালো।

প্রাচীন সমাজে মানুষের দেহে টোটেম এঁকে সনাক্ত করা হতো গোত্র। এই প্রথা উঠে গেলে চামড়ার প্রাথমিক স্তরে রঙ ঢুকিয়ে টোটেম আঁকা হতো। নৃ-তাত্ত্বিকদের অনুমান মিশরের রাজবংশ প্রতিষ্ঠার আগেই উল্কি আঁকা শুরু হয়েছে মিশরে। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে তা ক্রিট হয়ে ছড়িয়ে যায় গ্রিস, পারস্য, চীন ও জাপানে। জাপানি শিল্পীদের হাতে তা উন্নীত হয় চারুকলায়। নিউজিল্যান্ডের মাওরিদের মধ্যে উল্কি হয়ে ওঠে সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ব্রিটেনের আদিবাসীরা উল্কি আঁকত নীল রঙ দিয়ে। ব্রিটিশ নৌ-শক্তির উত্থানকালে উল্কি হয়ে ওঠে অশুভ চিহ্নের প্রতীক। ব্রিটিশ নাবিক পেইন, কুক, ম্যাগেলান, ড্রেক প্রভৃতি জাহাজে ভ্রমণ করার সময় বিভিন্ন উপকূলীয় মানুষের মধ্যে দেহ রঙ করার প্রথা অর্থাৎ উল্কি দেখেন। কুক দেখেন, রেড ইন্ডিয়ানরা ভেজা কাদা মাটি দিয়ে শরীর লাল রঙে রঙিন করেছে। তিনিই তাহিতি দ্বীপ থেকে Tatoo শব্দটি পাশ্চাত্য দেশে চালু করেন, যার অর্থ কাঠের ওপর ঠোকা। অ্যাসরিয়রা বিশ্বাস করত উল্কি দিয়ে নিজেদের আত্মীয় স্বজনদের চেনা যায়। তাই দেহে উল্কি আঁকা ছিল ধর্মীয় কর্তব্য। গ্রিস মেয়েরাও শরীরে রঙের প্রলেপ ব্যবহার করত। তারা এক ধরনের ভূমধ্যসাগরীয় গুল্ম দেখে অ্যালকানেই নামে লাল রং নিংড়ে গালে মাখত। শরীর ও মুখে লাগানো হতো সীসার সাদা রঙ। হোয়াইট লেড এক রকম বিষ। দেহে ক্ষত সৃষ্টি করে। এমনকি তাতে মৃত্যুও হতে পারে। তা সত্ত্বেও যুগ যুগ ধরেই প্রথাটি চালু ছিল।

গ্রিস ও মিশরের প্রসাধন জ্ঞানের যে বিকাশ ঘটে তার মূর্তিমতী প্রতীক হচ্ছে মিশর সিংহাসনের উর্বশী ক্লিওপ্যাটরা। ৫১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তিনি মিশরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ছিলেন কূটনৈতিক বুদ্ধি সম্পন্ন অসামান্য সুন্দরী। রোমের অসামান্য বীর সিজার ছিলেন বহু যুদ্ধের বিজয়ী নায়ক। কিন্তু তিনি হার মানেন ক্লিওপ্যাটরার সুরমা আঁকা ভ্রূর কাছে। কথিত আছে ক্লিওপ্যাটরা চোখের কোলে সুরমা মাখা ছাড়াও উপরের পাতায় মাখতেন আকাশী নীল রং। নিচের পাতায় মাখতেন নীল নদের সবুজ। কপোলে দিতেন শেল পারপল।

হিন্দু ধর্মের সধবা রমণীরা কপালে সিঁদুর পরেন। এটা প্রাচীন কালেরই রীতি। শরীরে উল্কি আঁকার প্রথা আদিবাসীদের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি। এটা তাদের কৃত্য ও ধর্মের অংশ। উল্কি অঙ্কন, সিঁদুর দান এবং তিলক গ্রহণ তিনটিই হচ্ছে সামাজিক প্রথা। এর সঙ্গে ধর্মেরও সম্পর্ক রয়েছে।

আদি কালে উল্কি ছিল ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে সনাক্ত করার চিহ্ন। বাংলাদেশের বেশিরভাগ উপজাতিই তাদের দেহে উল্কি আঁকে। এর মূল কারণ ধর্মীয়। এ ছাড়া এক ধরনের সংস্কারও রয়েছে। হিন্দু পুরাণে রয়েছে, একবার মহাদেব সব দেবতাদের

ডাকেন। গঁড় উপজাতির দেবতা সব দেবদেবীদের নিয়ে সভায় উপস্থিত হন। সব দেবীরাই মাটিতে উপবেশন করেন। তাদের সঙ্গে পার্বতীও ছিলেন। ভোজ শেষে গঁড় দেবতা চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু তিনি তার স্ত্রীকে চিনতে না পেরে দেবী পার্বতীর কাঁধে হাত দেন। এতে পার্বতী রেগে যান এবং দুঃখে কান্না জুড়ে দেন। মহাদেব গঁড় দেবতার ভুলকে হাল্কাভাবে দেখার চেষ্টা করেন। কিন্তু এতে পার্বতী রেগে যান। এরপর মহাদেব উল্কি আঁকার নির্দেশ দেন, যাতে উল্কিধারীদের জাত চেনা যায়।

'খোদনী' সম্প্রদায়ের শিল্পীরা সাঁওতাল ও ওরাওঁ সমাজের উল্কি আঁকে। শরীরের বিভিন্ন স্থানে উল্কি আঁকা হয়ে থাকে। এ সব স্থানের মধ্যে রয়েছে করতল, কপাল, বুক, গণ্ডদেশ, হাতের উল্টো পিঠ ইত্যাদি। উল্কি চিহ্নের মধ্যে রয়েছে লতাপাতা, গোল চক্র, টোটেম সম্ভূত গাছপালা, পশু-পাখি, সূর্য, চাঁদ-তারা ইত্যাদি। ওরাওঁদের বিশ্বাস, কোনো ব্যক্তি যদি উল্কি ছাড়া মারা যায়, তবে যমদেবতা তাকে মানুষ রূপে গ্রহণ করে না। এ কারণে মরদেহ দাহ করার আগে উল্কি এঁকে দিতে হয়। সাঁওতাল পুরুষরা বাম হাতে বেজোড় সংখ্যক উল্কি আঁকে। মেয়েরা উল্কি আঁকে হাতের কব্জি কিংবা বাহুতে। উল্কিবিহীন কোনো সাঁওতাল মেয়েকে তার শ্বাশুড়ি পুত্রবধূ হিসাবে গ্রহণ করে না।

উল্কি আঁকার প্রথা অনার্য সমাজে প্রচলিত ছিল। পরবর্তী সময়ে তা আর্য সমাজে গৃহীত হয়। গ্রামবাংলার নারী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে উল্কি আঁকার রীতি প্রচলিত রয়েছে। পেশাদার শিল্পীরা এসব উল্কি অঙ্কন করে থাকেন। তাদের খাতা ভর্তি থাকে বিচিত্র ধরনের ডিজাইনে। এসব ডিজাইনের মধ্যে রয়েছে পশু-পাখি, পৌরাণিক দেবদেবীর ছবি, লতা-পাতা, জন্তু-জানোয়ারসহ বিভিন্ন দ্রব্যের প্রতিকৃতি। মহিলাদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, 'মেয়েরা যে সব স্থানে অলঙ্কার পরিধান করে, সেখানে আঁকে অলঙ্কারের উল্কি। যেমন কপালে টিক, গলায় চিক কিংবা হাঁসুলির উল্কি।

উপজাতীয় সংস্কৃতিতে সিঁদুরের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। ওরাওঁ উপজাতি সমাজে একটি উপকথায় প্রচলিত রয়েছে, চার বন্ধুর মধ্যে একজন কাঠুরিয়া, একজন স্বর্ণকার, একজন তাঁতী এবং একজন সিঁদুর বিক্রেতা। কাঠুরিয়া গভীর অরণ্য থেকে কাঠ কেটে নির্মাণ করে অপূর্ব একটি নারী মূর্তি। তাতে সে প্রাণ দেয়। এই নারী মূর্তিটিকে অলঙ্কার পরায় স্বর্ণকার, তাঁতী পরায় কাপড় এবং সিঁদুর বিক্রেতা পরায় সিঁদুর। এরপর চার বন্ধুই মূর্তিটির অধিকার দাবী করে। তাদের ঝগড়া দেখে এক দেবতা উপস্থিত হন এবং বিষয়টির সমাধান দেন। তিনি বলেন, যে মূর্তি তৈরি করেছে সে তার বাবা; যে অলঙ্কার দিয়েছে সে মেয়েটির মামা; তাঁতী তার ভাই এবং যে সিঁদুর দান করেছে, সে মেয়েটির স্বামী। চার বন্ধু দেবতার বক্তব্য মেনে নেয়। এ কারণে সিঁদুর হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র বন্ধনের প্রতীক।

আদিম সমাজে লাল রঙের বিভিন্ন তাৎপর্য রয়েছে। যেমন-লাল রং যৌবন, উদ্দীপনা ও বিজয়ের প্রতীক। আদিম কালে গায়ে লাল রং মেখে মৃতদেহ কবর দেয়া

হতো। আদিম মানুষের বিশ্বাস ছিল লাল রং গায়ে মেখে দিলে মৃতের আত্মার প্রতি শান্তি বর্ষিত হয়। সেই রীতি উপজাতীয় সমাজে অব্যাহত রয়েছে।

মেয়ে বিবাহযোগ্য হলে সাঁওতালরা মেয়েদের গাঁয়ে উল্কি চিহ্ন এঁকে দেয়। বিয়েতে মেয়েরা লাল পেড়ে শাড়ি পরে। ত্রিপুরারা বিষু উৎসবে লাল রঙের কাপড় উপহার দেয়। হাজংরা দেহে উল্কি চিহ্ন আঁকে অপদেবতার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য। তান্ত্রিক শক্তির সাধকরা কপালে অঙ্কন করেন সিঁদুরের ত্রিশূল। বৈষ্ণবরা গলায় পরেন তুলসীর মালা। আর কপাল ও নাকে আঁকেন শ্বেতচন্দন। মানুষের মনে ঈশ্বরের ভয় প্রবেশ করার আগেই শুরু হয় উল্কি অঙ্কনের প্রথা। আর তা শুরু হয় ভয় থেকে; পরবর্তী সময়ে মানুষের মনে প্রবেশ করে ধর্মচিন্তা এবং ঈশ্বর ভীতি। তাই মানুষ তার দেহে উল্কি আঁকে অপদেবতার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য।

মানুষের প্রসাধন চর্চার মূল উদ্দেশ্য ছিল সৌন্দর্যানুভূতি। আর উল্কি অঙ্কনের সৃষ্টি হয়েছে দুর্যোগ মুক্তির বাসনা থেকে। কবি ঈশ্বর গুপ্তের মতে কপালে সিঁদুরের বিন্দুও যেন এক ধরনের উল্কি। পাথর যুগ শেষে মানুষ যখন নতুন যুগে ছোট ছোট গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়, তখন তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় রক্তক্ষয়ী সংঘাত। তাই নিজেদের লোক চেনার জন্য চামড়া কেটে এঁকে দেয়া হয় টোটেম। এর অনেক পড়ে চামড়ার উপরের স্তরে রং ঢুকিয়ে অঙ্কন করা হয় উল্কি। প্রাচীনকালে মালয়ের অধিবাসীরা কলেরার প্রতিষেধক হিসাবে শরীরে অঙ্কন করত সাদা-কালো-লাল রঙের উল্কি। ব্রিটেনে রাণী অ্যানির রাজত্ব কালে উল্কি অঙ্কনের রীতি বন্ধ হয়ে যায়। সে সময় লাল-নীল রঙে আঁকা মেয়েদেরকে ডাইনী বলে চিহ্নিত করা হতো।

কোনো কোনো সমাজে উল্কাপাতের অশুভ রাহু থেকে রক্ষা পাবার জন্য উল্কির প্রচলন হয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগে যে উল্কি অঙ্কন শুরু হয়, বর্তমানে তা পেয়েছে নতুন ব্যাপ্তি। ফুটবল ও ক্রিকেট মাঠে খেলা দেখার জন্য তরুণ দর্শকরা কপালে ও চিবুকে উল্কি এঁকে মাঠে প্রবেশ করে। তারা উল্কির প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করে দেশ ও জাতির প্রিয় চিহ্নগুলো। যেমন-জাতীয় পতাকা, দলীয় পতাকা, প্রিয় পশু-পাখির প্রতিকৃতি ইত্যাদি। ঈদের রাতে মুসলমান ছেলে মেয়েরা তাদের দু'হাতে মেহেদীর রঙে আঁকে লতা-পাতা ও ফুল-পাখির চিহ্ন। তা একান্তভাবেই সৌন্দর্য চর্চার অংশ।

আদিবাসী জীবন

খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবানে রয়েছে এগারটি উপজাতি। তাদের কথ্য ভাষার সংখ্যা দশটি। তাদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই পূজা-পার্বণ, রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান ও নৃত্যগীতের মিল রয়েছে। চাকমা, মারমা, তঞ্চঙ্গ্যা, ম্রো, খুমী, খিয়াং ও চাক উপজাতিরা হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। কাজেই তাদের মধ্যে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের অনেক বেশি সাদৃশ্য রয়েছে। লুসাই, পাংখোয়া ও বম উপজাতিরা হচ্ছে খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী। ত্রিপুরা উপজাতি সনাতন ধর্মে বিশ্বাস করে।

বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিরা শত শত বছর ধরে পাশাপাশি রয়েছে; কিন্তু তাদের মধ্যে সংঘাত-বিদ্রোহ ও যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। বরং প্রতিটি উপজাতিরই রয়েছে আদি সাংস্কৃতিক সত্ত্বা। তাদের প্রধান সামাজিক উৎসবগুলো জন্ম, জীবন, বিয়ে ও মৃতদেহ সৎকারকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। তাদের জীবনে একটি শিশুর জন্ম হয় জীবনের আনন্দ নিয়ে। তারা কঠোর জীবন সংগ্রামে নিয়োজিত থেকেও শিশুর জন্মকে গ্রহণ করে আনন্দের সঙ্গে। তবে এ নিয়ে তাদের মধ্যে কিছু সংস্কার রয়েছে।

চাকমা সমাজে একজন প্রসূতি তার সন্তান জন্ম দেয় মহিলার নিজের ঘরে কিংবা স্বামীর গোষ্ঠীর ঘরে। এটি সম্ভব না হলে গর্ভবতী মাকে পৃথক ঘর গড়ে দিতে হয়। শিশুর জন্মের পর প্রসূতিকে রান্না ঘরে প্রবেশ করতে দেয়া হয় না। চাকমারা মাকে পবিত্র করার জন্য 'কজই পানি লনা' নামে একটি উৎসবের আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠানে আত্মীয়-স্বজনকে খাওয়ানো হয়। ধাইকে বিদায় দেয়া হয়। শিশুর নাম রাখা হয়। এই অনুষ্ঠানটি খুবই আনন্দদায়ক। তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে কোনো গর্ভবতী মহিলা সন্তান জন্ম দান করার পর তাকে অশুচি বলে গণ্য করা হয়। প্রসূতিকে যে খাবার দেবে তাকেও স্নান করে পবিত্র হতে হয়। তাই বলে শিশুর জন্মের আনন্দ ব্যর্থ হয় না।

উপজাতীর জনগোষ্ঠীর কাছে বিয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রায় প্রত্যেক উপজাতীয় সমাজেই কনেকে পণ দেয়ার প্রথা রয়েছে। এসব পণের মধ্যে রয়েছে মায়ের দুধের পণ, বাবার ভরণ পোষণের পণ, আত্মীয়দের দ্বারা কনেকে লালন-পালন করার পণ প্রভৃতি। চাকমা ও খিয়াংদের বিয়ে বরের বাড়িতে সম্পন্ন হয়। মারমা, তঞ্চঙ্গ্যা, ত্রিপুরা ও চাকদের বিয়ে সম্পন্ন হয় কনের বাড়িতে। প্রত্যেক উপজাতির নিজস্ব রীতি অনুসারে বিয়ে সম্পন্ন হয়। বিয়ের অনুষ্ঠানে সামর্থ অনুসারে ভোজ সভার আয়োজন করে উপজাতিরা। বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান, জুমচাষ ও নাট্যগীতি আদিবাসীদের জীবনকে আনন্দময় করে রাখে। তাদের মধ্যে সম্পদ সঞ্চয়ের আকাঙ্ক্ষা খুবই কম। ফলে তারা

জীবন যাপনের ব্যাপারে সৎ ও নিয়মনিষ্ঠ। তাদের আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে গো-হত্যা, গ্রামদেবতার পূজা, ভূত পূজা, বিজু উৎসব প্রভৃতি। মানবধারার দিক থেকে অধিকাংশ উপজাতিই মঙ্গোলীয় নৃ-গোষ্ঠীর। তাদের দৈহিক গঠন ও আচার-ব্যবহারে রয়েছে সেই প্রভাব। বেশিরভাগ উপজাতির মধ্যে রয়েছে বার্মা, আরাকান, চীন, মিজোরাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলের উপজাতির ধর্ম ও ঐতিহ্যের প্রভাব। তাদের জীবনে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য প্রাচীন গাঁথা, লোককাহিনী, নাট্যগীতি, নাচ, গান, প্রবচন, প্রবাদ ও রূপকথা। তারা অত্যন্ত সরল বলে প্রাচীন গল্পগুলো সত্য বলে মেনে নেয় এবং সেভাবেই জীবন যাপন করে। 'গো-হত্যা' অনুষ্ঠানের সূচনা সেভাবেই হয়েছে।

কোনো উপজাতি বসবাস করে পাহাড়ের চূড়ায়। আবার কোনো উপজাতি বসবাস করে নদীর তীরে। পাহাড়ি এলাকার আদিবাসীদের বলা হয় 'টংথা'। এটি একটি আরাকানী শব্দ। এর অর্থ পাহাড়ের সন্তান।

আরাকানী ভাষায় 'খ্যাং' অর্থ নদী। নদীর তীরে যে সব আদিবাসী বসবাস করে, তাদেরকে বলা হয় 'খ্যাংথা'। এর অর্থ নদীর তীরের সন্তান। টংথা-দের মধ্যে রয়েছে লুসাই, পাংখো, বম, ম্রো ও খুমী উপজাতি। 'খ্যাংথা'-দের মধ্যে রয়েছে চাকমা, মারমা, তঞ্চঙ্গ্যা ও খ্যাং উপজাতি। তবে প্রতিটি আদিবাসী জাতিসত্ত্বার জীবনই পাহাড় নির্ভর। জুমচাষ হচ্ছে তাদের প্রধান পেশা এবং প্রধান সংস্কৃতি।

জুম হচ্ছে বিশেষ কৃষি কৌশলের নাম। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন কৃষি পদ্ধতি। জুম চাষের জন্য পাহাড়ের ঝোপ-ঝাড় ও গাছপালা কেটে পরিষ্কার করা হয়। এসব ঝোপ-ঝাড় ও গাছপালা শুকিয়ে গেলে এতে জুমিয়ারা আগুন লাগিয়ে দেয়। এতে জমিও পরিষ্কার হয়। প্রাকৃতিক সারও হয়। জুম চাষের জন্য লাঙলের প্রয়োজন হয় না। কায়িক শ্রমই জুম চাষের প্রধান উপাদান। একটি জমিতে যত বছর জুম চাষ করা যায়, তাকে বলে জুম সাইকেল। আগে জমি বেশি দিন জমি উর্বর থাকত। আগে একই জমিতে পনেরো বছর জুম চাষ করা যেত। বর্তমানে তা হ্রাস পেয়ে হয়েছে তিন-চার বছর। জুমচাষের জন্য জমিতে সার লাগে না। কীটনাশক লাগে না। পানি সেচের প্রয়োজন হয় না। জুম চাষে মূলধন লাগে খুবই সামান্য। পতিত জমিতে জুম চাষ করা হয়।

জুম চাষের সাইকেল কমে যাবার ফলে জুমিয়াদের বার বার জমি পরিবর্তন করতে হয়। এতে জুম চাষে দৈহিক শ্রম ও মূলধন উভয়ই বৃদ্ধি পায়। ঐতিহ্যগত কারণে জুম চাষে ব্যক্তিগত মালিকানা নেই। জুম চাষের মালিকানা যৌথ। জুম চাষের ক্ষেত্রে সাধারণত চার ধরনের মিশ্রিত পদ্ধতি দেখা যায়-

(১) আউশ ধান + কলা;

(২) আউশ ধান + কলা +পেঁপে;

(৩) আউশ ধান + মার্ফা + শীম জাতীয় ফসল + সব্জি;

(৪) আউশ ধান + শীম + তুলা + আদা + হলুদ ইত্যাদি।

পুরুষ ও মহিলা উভয়েই জুম চাষে অংশ নেয়। উপজাতীয়রা সাধারণত হিসাব-নিকাশ জানে না। তারা নিজেদের সম্পদ সংরক্ষণও করে না।

জুম শুধু এক ধরনের চাষের পদ্ধতি নয়। এর সঙ্গে উপজাতীয় সংস্কৃতির নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। জুম চাষকে কেন্দ্র করে উপজাতীয় সমাজে সৃষ্টি হয়েছে নৃত্যগীত ও পূজা-পার্বণের অমূল্য সংস্কৃতি। মানব জাতির শেকড় সন্ধানের জন্য এই সংস্কৃতির রয়েছে অপরিসীম গুরুত্ব।

আদিকালেও পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতীয় আদিবাসী নৃ-গোষ্ঠীর বসবাস ছিল। এ অঞ্চলের সবচেয়ে পুরোনো অধিবাসী ছিল 'কুকি' নৃ-গোষ্ঠী। এরপর অন্যান্য নৃ-গোষ্ঠীর আগমন ঘটে। ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে চাকমা উপজাতির নাম পাওয়া যায়। চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরারা হচ্ছে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যা গরিষ্ঠ উপজাতি।

একসময় পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশাল পার্বত্য এলাকা, কর্ণফুলী নদী অববাহিকা, চেঙ্গী কাচাল সহ প্রভৃতি এলাকা জনবসতিহীন ছিল। 'কুকি' নৃ-গোষ্ঠীর অস্তিত্ব থেকে অনুমান করা হয়, শ্বাপদ-সঙ্কুল পার্বত্য জনপদে একাদশ শতক থেকে জনবসতি শুরু হয়েছে। 'কুকি'রা ছিল শিকারজীবী কিংবা জুমচাষী।

বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের আয়তন ৫০৮৯ বর্গমাইল। অর্থাৎ বাংলাদেশের মোট আয়তনের এক দশমাংশ। অথচ এই অঞ্চলে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এক শতাংশের কম লোক বসবাস করে। তাদের মধ্যে অর্ধেকের কিছু বেশি আদিবাসী; বাকিরা বাঙালি। এই অঞ্চলে বাঙালিদের বসবাস শুরু হয়েছে অনেক পড়ে। চাকমারা উপজাতি হলেও তারা কর্ণফুলীর উচ্চ তটভূমিতে বসবাস শুরু করে। একই নদীর নিম্ন তটভূমিতে বসবাস শুরু করে বাঙালিরা। এর ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। চাকমারা বাংলা নবান্ন উৎসবের মতো জুমচাষ ভিত্তিক উৎসব পালন করে। চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যাদের একটি জুমনৃত্যের নাম 'ইপ্রাআকা'। চাকরাও নবান্ন উপলক্ষে 'ইপ্রাআকা' পরিবেশন করে। এই নৃত্যগীতে চাক শিল্পীদের হাতে থাকে ফসল কাটার কাস্তে। চাক তরুণীরা কোমরে বিছা, গলায় বুনো ফুলের মালা এবং খোঁপায় ফুল পরে নৃত্যে অংশ নেয়।

'উসুই' উপজাতির নবান্ন উৎসবের নাম 'মাইলুক্মা'। গ্রামের মানুষ একত্রিত হয়ে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। পুরুষ ও মহিলা নৃত্য শিল্পীরা তাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে মাইলুক্মা গীতি নাট্যে অংশ নেয়। নাচের সর্দার পরেন চাদোয়া কাপড়ের লম্বা আলখেল্লা। হাতে থাকে অলঙ্কৃত বাঁশ। তিনি নৃত্য পরিচালনা করেন। পুরুষ শিল্পীদের হাতে থাকে ধানের গোছায় নির্মিত একটি প্রতীক। মহিলারা পরে পুঁতির মালা। বর্ষ বিদায় উৎসব, বর্ষ বরণ উৎসব, নবান্ন উৎসব, জুম উৎসব ইত্যাদি উৎসবে মুখর থাকে উপজাতীয় গ্রাম।

বেশিরভাগ উপজাতিই নিরক্ষর। তাদের মধ্যে অনেকেরই আবার লিখিত গ্রন্থ নেই। তারা নিজেদের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে যুগ থেকে যুগান্তরে পৌঁছে দেয় উৎসবের মাধ্যমে। তাই তাদের মুখের ভাষার সংস্কৃতি অনেক বেশি সচল ও দৃঢ়নিবদ্ধ। একসময় চাক উপজাতি বসবাস করত বাইশারী অঞ্চলে। পরে এটি পাইনছিরি নামে পরিচিত হয়। এই অঞ্চলে এক সঙ্গে বসবাস করে মুসলমান, হিন্দু, মারমা, ম্রো ও চাক উপজাতি। ১৭০৫ খ্রিস্টাব্দের আগে এখানে শুধু চাকরাই বসবাস করত। অন্যান্য উপজাতিরা এসেছে পরে।

আগের দিনে চাকরা ছিল সম্পূর্ণ স্বচ্ছল। তাদের জীবনে অভাব-অনটন ছিল না। তারা জুম চাষের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণ ধান ও অন্যান্য ফসল উৎপাদন করত। তাই চাকরা তাদের বাসস্থান পাইনছিরিকে ফুলের মতো পবিত্র স্থান বলে গণ্য করত। সে সময় এই এলাকায় কোনো স্কুল ছিল না। তবে প্রতিটি গ্রামে ছিল একটি 'চেরেক' অর্থাৎ কমিউনিটি সেন্টার। সেখানে ছেলেদেরকে বার্মিজ ভাষায় শিক্ষা দেয়া হতো। মেয়েদের জন্য লেখা-পড়ার ব্যবস্থা ছিল না। ১৯৫৩ সালের দিকে রাখাইন সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ ভিক্ষু উসেন্ডাওয়েংছা মহাথেরো নামে একজন ধর্মগুরু এই অঞ্চলে বসবাস শুরু করেন এবং চাকদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উদ্যোগ নেন। তিনি বার্মিজ ভাষায় চাকদের শিক্ষা দিতেন। একই সঙ্গে বাংলা ভাষা শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিতেন। তার উদ্যোগেই 'পাইনচরি' অঞ্চলে নির্মিত হয় বৌদ্ধ বিহার ও প্যাগোডা। চাকরা বিয়ের অনুষ্ঠানকে বলে 'মঙলাঙপো'। কন্যাকে মা-বাবার ঘর থেকে বিদায় দেয়ার সময় যে গান গাওয়া হয়, তাকে বলে 'চিকহান'। 'চিকহান' গান এক ধরনের মাঙ্গলিজ প্রার্থনা। এর প্রথম দুই চরণের অর্থ হচ্ছে 'মার দুধ যেমন বিশুদ্ধ তোমার জীবন হোক তেমন মঙ্গলময়। মার দুধ যেমন বিশুদ্ধ তেমনি তোমার যাত্রা হোক শুভ।' চাকদের মধ্যে ছড়াগান ও ঘুম পাড়ানি গান প্রচলিত রয়েছে। চাকরা বিশ্বাস করে, মৃত্যুর পর আত্মা রক্ত সম্পর্কীয় বংশে পুণর্জন্ম লাভ করে। তাই তারা পুণর্জন্মের প্রার্থনা করে গায় 'কমাঙ্ চিকহান গান। একটি গানের বাংলা অর্থ হচ্ছে-

'পথে একদিন থেকো না
পথে দুদিন থেকো না
তোমার কুলে আবার এসো।'

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের মধ্যে খিয়াংরা অন্যতম। তাদের সংখ্যা তেমন বেশি নয়। লুসিয়ান বর্নাট নামে একজন পর্যটক লেখেন, ১৯৫২ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের সাংগু ও কর্ণফুলী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের চেমী মৌজায় ৫০০ খিয়াং বসবাস করে। খিয়াংরা পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি ও বান্দরবানে বসবাস করে। ১৯৯১ সালে তাদের সংখ্যা ছিল ১৯৫০ জন। ১৯৯৭ সালে এই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২১০৫ জন। খিয়াংদের মধ্যে দুটি গোত্র রয়েছে-'লাইতু হিয়াউ'এবং 'কংন্ত হিয়াউ'। যারা সমতলে

বসবাস করে তাদেরকে বলা হয় 'লাইতু'। পাহাড়ি এলাকায় বসবাসকারীরা 'কিংন্ত' হিসাবে পরিচিত। খেয়াংদের রয়েছে ঐতিহ্যবাহী পোশাক। তাদের পোশাকে থাকে সাদার উপর লাল অথবা লালের উপরে সাদা দিঘল স্ট্রাইপ। এই পোশাক তারা রাষ্ট্রীয় এবং জাতীয় অনুষ্ঠানে পরিধান করে। এটা সাধারণত মেয়েরা ব্যবহার করে। উপরের অংশ খাদি পাঞ্জাবির মতো। নিচের অংশ থামির মতো। ঐতিহ্যবাহী এই পোশাকটি সেলাই করা হয় না। আধুনিক খিয়াং মহিলারা মারমা অথবা বার্মিজদের মতো পোশাক পরে। রাঙ্গামাটির খিয়াংরা বেশিরভাগ খ্রিস্টান। বান্দরবানের খিয়াংরা বৌদ্ধ। তাদের সবচেয়ে বড় দেবতার নাম হচ্ছে 'নাদ্‌গা'। শব্দটি মারমা ভাষা থেকে এসেছে। তাদের শস্য দেবীর নাম হচ্ছে 'বুগলেমা'। 'ক্রাকহ্না' হচ্ছে গৃহদেবতা। খিয়াংদের নিজস্ব ভাষা থাকলেও হরফ নেই। তাদের মুখের ভাষা গড়ে উঠেছে পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য উপজাতি এবং অউপজাতীয়দের ভাষার সংমিশ্রণে। অক্ষরজ্ঞানহীন খিয়াংরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে নিজেদের স্বকীয়তা বজায় রেখেছে।

ত্রিপুরা সমাজে শিশুর জন্ম থেকে কৈশোর পর্যন্ত সাতটি ধাপে পূজা-অর্চনা করা হয়। মা গর্ভবতী হবার সঙ্গে সঙ্গে মা ও শিশুর মঙ্গলের জন্য 'তৈচাওমি' (জলদেবী)-র সম্মানে জল পূজা করা হয়। সন্তান জন্মের মাটির দেবতার সম্মানে স্থল পূজা করা হয়। ত্রিপুরাদের ভাষায় জলদেবতার নাম 'গবেংবুমি'। শিশুর জন্মের পাঁচ-সাত মাসের মধ্যে শিশুকে পরানো হয় পুঁতির মালা। এই উপলক্ষে পূজার আয়োজন করা হয়। ত্রিপুরা ভাষায় জঙ্গলী ভূতকে বলা হয় 'বুরাহ'। ত্রিপুরাদের আবাসস্থল হচ্ছে অরণ্য বা বন জঙ্গল। এই অরণ্যকে ঘিরেই তাদের জীবন। তাই ত্রিপুরারা পুঁতি পরানোর অনুষ্ঠানের পর শিশুকে ভবিষ্যতে জঙ্গলী ভূতের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য জঙ্গলী ভূতের পূজা করে। এরপর যথাক্রমে বেদালিক পূজা, ম্ল পূজা এবং সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ জানানোর উদ্দেশ্যে পূজা করা হয়। তাই ত্রিপুরাদের মধ্যে জন্মের অভ্যর্থনা খুবই আনন্দদায়ক। তারা মৃত ব্যক্তির প্রতিও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে।

ত্রিপুরা সমাজে মরদেহকে গোসল করিয়ে নতুন পোশাক পরানো হয়। এরপর তাকে বসানো হয়। অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে রয়েছে সাদা-কালো সুতোর মালা পরানো, মাথায় চিরুনি, লোহার শিক ও সজারুর কাটা স্থাপন করা ইত্যাদি। মৃত্য ব্যক্তির আত্মা এসব অস্ত্র দিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে পারবে বলে ত্রিপুরাদের বিশ্বাস। এ ছাড়া তারা মৃত ব্যক্তির পাশে রাখে ভাত ও সিদ্ধ মুরগীর ছানা।

ত্রিপুরারা মৃত ব্যক্তিকে তুলনা করে রাজার সঙ্গে। তাই মৃত ব্যক্তির আসনের উপর টাঙ্গানো হয় লাল আলোয়ান বা চাদর। চারদিকে রশি দিয়ে ঝুলানো হয় রং-বেরঙের কাপড়। ত্রিপুরা সমাজ মৃত ব্যক্তির জন্য শোক জ্ঞাপন করে তোপধ্বনির মাধ্যমে কিংবা বাজি ফুটিয়ে। ঢাক-ঢোল পিটিয়ে তার মৃত্যু সংবাদ জানানো হয়। লাশ দাহ করার পর তারা মৃত ব্যক্তির আত্মার জন্য শান্তি কামনা করে।

মৃত্যু মানুষের অনিবার্য ফল। তা সত্ত্বেও মানুষ অমরতায় বিশ্বাস করে। এই জন্যই উপজাতীয় সমাজ তাদের মৃত আত্মীয় স্বজনের আত্মার মঙ্গল কামনার জন্য নানা ধরনের পূজা-অর্চনা করে। মঙ্গল কামনা করে।

ত্রিপুরারা তাদের সামাজিক উৎসবে নানা রকম নৃত্যগীত পরিবেশন করে থাকে। এর মধ্যে বোতল নাচ অন্যতম। ত্রিপুরারা বিয়ের অনুষ্ঠানে এই নাচ পরিবেশন করে। বোতল নাচের মধ্যে থাকে বর ও কনে পক্ষের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব। উভয় পক্ষ ঐতিহ্যবাহী পোশাকে সজ্জিত হয়ে আমন্ত্রিত অতিথিদের সামনে কলসি রেখে বোতল মাথায় নিয়ে নৃত্য পরিবেশন করে। এটা অনেকটা ভারসাম্য রক্ষার নৃত্য। যে পক্ষের মাথা থেকে বোতল আগে পড়ে যায়, সেই পক্ষ পরাজিত বলে গণ্য হয়। ত্রিপুরা উপজাতি ঐতিহ্যবাহী 'শিমুর' এবং 'ঢোল' বাজিয়ে নৃত্যগীতের চমৎকার আবহ সংগীতের সৃষ্টি করে। অনেক সময় বোতল নাচের সময় দুই করতলে থালাও থাকে। এই নৃত্যটি ত্রিপুরা সমাজে খুবই প্রিয়।

ত্রিপুরা উপজাতি নৃ-গোষ্ঠী হিন্দু। তারা অনেকগুলো দেবদেবীর পূজা করে। এসব দেবদেবীর মধ্যে রয়েছে লক্ষ্মী, স্বরস্বতী, গঙ্গা, কার্তিক, গণেশ, হরি, উমা, কামদেব, হিমালয়, ব্রক্ষা, সমুদ্র, অগ্নি ইত্যাদি। তারা ভূত-প্রেত ও অপদেবতায় বিশ্বাস করে। ত্রিপুরারা অন্যান্য উপজাতির মতো চৈত্র মাসের শেষ দুই দিন এবং বৈশাখ মাসের প্রথম দিন বৈসুক উৎসব পালন করে। তারা নববর্ষের দিনকে বলে 'বিসিকাতাল। আর চৈত্রের শেষ দুই দিনকে বলে যথাক্রমে 'হারি বৈসুক' ও 'বইযুকমা'।

ত্রিপুরারা 'বসরণি মাতাহ' বা 'বছরের দেবতা'র পূজা করে। এই পূজাকে তার গৃহ পূজা হিসাবেও চিহ্নিত করে। এই পূজা মাঘ মাস থেকে শুরু হয়ে চৈত্র্য মাসের বর্ষ বিদায় পূজার পূর্ব পর্যন্ত চলে।

ত্রিপুরাদের 'বছরের দেবতা'র পূজা অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলেই নৃত্যগীতে অংশ নেয়। নাচ ও গানের তালে তালে বাজে ঢোল ও বাঁশি। ত্রিপুরা উপজাতির মানুষ অত্যন্ত নাচ-গান প্রিয়। তারা প্রতিটি পূজা ও উৎসবকে আনন্দময় করে তোলে নাচ-গানের মাধ্যমে। তারা উৎসবে পরিবেশন করে উন্নত মানের খাবার ও মদ।

উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে চাকমারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। তারা মঙ্গোলয়েড নৃ-গোষ্ঠীর উপজাতি। পার্বত্য চট্টগ্রামে তারা বিভিন্ন নামে পরিচিত। তারা মারমাদের কাছে 'ঠেক', ত্রিপুরাদের 'কাছে চংমা' পাংখোয়াদের কাছে 'আই' এবং এবং লুসাইদের কাছে চাকমা নামে পরিচিত। বাঙালিরা তাদেরকে চাকমা উপজাতি হিসাবে চেনে। পার্বত্য অঞ্চলের মোট উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর শতকরা ৭৮ ভাগই চাকমা। চাকমাদের ধর্ম বৌদ্ধ হলেও আচার-অনুষ্ঠানে হিন্দু ধর্মের প্রভাব রয়েছে। তারা গাছ-পালা, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, চন্দ্র-সূর্য, ভূত-প্রেত ও অপদেবতার পূজা করে।

চাকমাদের পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে সৃষ্টিকর্তা গোঝেন জলময় ধরিত্রী থেকে আলো, অন্ধকার ও স্থলভূমির সৃষ্টি করেন। পরে তিনি প্রকৃতিকে নারী রূপ দিয়ে পৃথিবী সৃষ্টি করেন। চাকমারা 'বিজু' উৎসব ছাড়াও মাঘীপূর্ণিমা, মধুপূর্ণিমা, বৈশাখীপূর্ণিমা, গাড়িটানাসহ বহু উৎসব পালন করে। অন্যান্য উপজাতির মতো চাকমারা নিজেদের বস্ত্র নিজেরাই বয়ন করে। চাকমা মেয়েরা কোমর তাঁতে বোনা কাপড় পরিধান করে। তাতে কোনো সেলাই থাকে না। একদিকে নকশা খচিত আঁচল থাকে। মেয়েদের এই পরনের কাপড়কে বলে পিনন। আঁচলকে বলে 'কাবুকি'।

আঁচলে থাকে বিচিত্র ধরনের নকশা। এসব নকশার মধ্যে রয়েছে রঙ-বেরঙের ফুল, ফল, পাখি, পশু, লতা-পাতা প্রভৃতি। পিননের জমিন সাধারণত কালো রঙের হয়। উপরে-নিচে চার ইঞ্চি চওড়া দুটি বর্ডার থাকে। এর সঙ্গে থাকে বক্ষবন্ধনী। এর নাম 'খাদি'। লাল রঙের খাদিকে বলা হয় 'রাঙাগাদি'। রাঙাখাদির লাল জমিনের উপর থাকে বিচিত্র রঙ ও ডিজাইনের নকশা। অনেক শিক্ষিত চাকমা আদিবাসী জীবন ছেড়ে হয়েছে নগরবাসী। কিন্তু নিজস্ব সংস্কৃতি ত্যাগ করেনি।

বান্দরবান পার্বত্য জেলার আধিবাসীরা পাঁচটি প্রধান ধর্মে বিভক্ত। এসব ধর্মের মধ্যে রয়েছে বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, হিন্দু, ক্রামা ও ইসলাম। এ জেলার মারমা, চাকমা, চাক, তঞ্চঙ্গ্যারা প্রধানত বৌদ্ধ ধর্মে বিশ্বাসী। তাছাড়া খুমী ও খিয়াংরা অধিকাংশই বৌদ্ধ। ম্রোদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক এই ধর্মে বিশ্বাসী। বম, লুসাই ও পাংখোয়ারা প্রধানত হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী। ত্রিপুরারা অধিকাংশ হিন্দু। মারমা, চাকমা, ম্রো, খুমী ও খিয়াংদের মধ্যে অল্প সংখ্যক হিন্দু ধর্মালম্বী উপজাতি রয়েছে। মারমা, চাকমা, ত্রিপুরা, বম ও তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক মুসলমান রয়েছে। এ ছাড়া ম্রো ও খুমীদের মধ্যে কিছু ক্রামা ধর্মে বিশ্বাসী উপজাতি রয়েছে।

উপজাতীয় জনসাধারণের মধ্যে ধর্মের অনুপ্রবেশের ঐতিহাসিক কারণ রয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে আরাকানী মহারাজার প্রভাবে। এ কারণে বৌদ্ধ ধর্মের উপজাতিদের মধ্যে বার্মিজ সংস্কৃতির প্রভাব রয়েছে। হিন্দু ধর্মের প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে ত্রিপুরা মহারাজার প্রভাব প্রতিপত্তির সময়ে। ইসলাম ধর্মের প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে পাকিস্তান আমলে। খ্রিস্টান ধর্মের প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে ইংরেজ মিশনারিদের প্রচেষ্টায়।

বান্দরবানে ক্রামা ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে আশির দশকে। ক্রামা ধর্মের ধর্মগুরু হচ্ছেন মেনলে ম্রো। তিনি ম্রো উপজাতির লোক এবং ম্রো বর্ণমালার প্রবর্তক। ক্রামা ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে মদ, আফিম ও জুয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার মাধ্যমে। ক্রামা ধর্ম মতে, মানুষের পুণর্জন্ম আছে। স্বর্গ ও নরক আছে। আত্মার জন্ম এবং পুণর্জন্মের মাধ্যমে মানুষ স্বর্গ ও নরক লাভ করে। তাই মানুষের মুক্তির লক্ষ্য হচ্ছে পুণর্জন্মের মাধ্যমে স্বর্গপ্রাপ্তি। এর জন্য ম্রোদের অবশ্যই দশটি নিয়ম পালন করতে হবে। মদ ও আফিম

সেবন, ধুমপান এবং জুয়া খেলা অবশ্যই বর্জনীয়। ক্রামা ধর্মালম্বীরা বিয়ের অনুষ্ঠানে মদের পরিবর্তে চা বা রং চা পরিবেশন করে। ক্রামা ধর্মালম্বী উপজাতীয় মানুষের মধ্যে প্রাণী হত্যা নিষিদ্ধ। তবে রক্তহীন প্রাণী ও মাছ খাওয়া সিদ্ধ। উপজাতীয় মানুষের মধ্যে ধর্ম পালনে কঠিন বিধি-নিষেধ নেই। তাদের কাছে উৎসব পালন, খাওয়া-দাওয়া, মদ্য পান এবং নৃত্যগীত উপভোগ করাটাই সবচেয়ে বড় কথা।

ম্রো শব্দের অর্থ গোষ্ঠী বা গোত্র। গোত্রগুলো আদি পিতারূপী বৃক্ষের নামে পরিচিত। যেমন- কলাগাছ, মোরগফুল গাছ, বন্য কলাগাছ, কাঁঠাল গাছ ও আম গাছ। নৈজার বা কাঁঠাল গাছ গোত্রের ধারণা, আদিকালে অরণ্যে এক কাঁঠাল গাছ ছিল। সেই গাছের আশ্চর্য সুন্দর পাকা কাঁঠাল থেকে বেরিয়ে আসে এক রূপসী কন্যা। ঠিক একইভাবে কলাগাছ থেকে বেরিয়ে আসে এক সুন্দর পুরুষ। তাদের সন্তানেরা হচ্ছে এসব গোত্রের লোক। ম্রোদের বিশ্বাস, 'তুরাই' হচ্ছে বিশ্বসৃষ্টির দেবতা। তাদের গৃহ দেবতা হচ্ছে ওরেং। তারা 'তুরাই' দেবতার চেয়েও অধিকতর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে ওরেং দেবতার প্রতি। ম্রোরা বিশ্বাস করে সংসার জীবনের সুখ-দুঃখ তার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই ম্রো ওরেং দেবতার নামে পূজা হয় সবচেয়ে বেশি জাঁকজমকপূর্ণ। তারা জুম চাষের প্রারম্ভে শ্রাবণ মাসে ভরা নদীর কিনারে এসে গিয়ে গো-হত্যা করে। ম্রো সমাজ নৃত্যগীত প্রিয়। এ কারণে প্রতিটি উৎসবে তারা নাচ-গান পরিবেশনের মাধ্যমে আনন্দ উপভোগ করে। তারা উৎসবের সময় পচা ভাত, শূকর, শুটকি মাছ ও ব্যাঙের পচানো চর্বি দিয়ে 'নাপপী' নামে এক প্রকার খাদ্য বানায় এবং পরিবারের সকলে মিলে আনন্দ সহকারে খায়।

ম্রো তরুণীরা সৌন্দর্য চর্চার অংশ হিসাবে শরীর ও মুখে লাল রং মেখে রাখে। তারা অলঙ্কার হিসাবে পরিধান করে পুঁতির মালা, ধাতব দুল, চুড়ি ও বাজু। ম্রোদের একটি উল্লেখযোগ্য উৎসব হচ্ছে 'কুমলাং। জুমের ফসল তোলার সময় এই উৎসব হয়। এই উৎসবে তারা একটি ষাড়কে হত্যা করে। এই ষাড়টিকে তারা যূপকাষ্ঠে বাধে। এরপর নারী-পুরুষ সকলে মদ্য পান করে নাচতে নাচতে ষাড়টিকে বাঁশের শলাকা দিয়ে আঘাত করে। ষাড়টি মারা গেলে তার রক্ত চোঙায় ভরে সকলে মিলে খায়। এই উৎসবের সঙ্গে সাইবেরিয়ার আদিবাসীদের 'ভালুক উৎসব'-এর মিল রয়েছে।

ম্রোদের মধ্যে 'চম্পুয়া' নামে আরেকটি উৎসবের প্রচলন রয়েছে। এই উৎসবে তরুণ-তরুণীরা কলাপাতা আনতে গহন অরণ্যে প্রবেশ করে। সেখানেই চলে তাদের নৃত্যগীত। এই উৎসবেরও গো হত্যা করা হয়। ম্রো সমাজে গো-হত্যার একটি গভীর তাৎপর্য রয়েছে। তাদের মধ্যে একটি কাহিনী প্রচলিত রয়েছে, সৃষ্টিকর্তার নির্দেশে একটি মহা ধর্ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ম্রো সমাজের প্রতিনিধি ছাড়া সকল ধর্মের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিল। সৃষ্টিকর্তা কলা পাতায় লেখা ম্রোদের ধর্ম গ্রন্থ পাঠান একটি গরুর মাধ্যমে। গরুটি কলাপাতা খেয়ে ফেলে। এ জন্য ম্রো সমাজে কোনো ধর্ম

গ্রন্থ পৌঁছেনি। এ কথা সৃষ্টিকর্তা জানার পর ম্রো জাতির কাছে তিনি নির্দেশ দেন, 'গরুর শাস্তি স্বরূপ তোমরা গো-হত্যা করো।' এ কারণেই ম্রোদের মধ্যে গো-হত্যা একটি ধর্মীয় পবিত্র কর্ম। আনন্দ উপভোগ ছাড়াও ধর্মীয় অর্থে নৃত্যগীত খুব তাৎপর্যপূর্ণ। তাদের বিশ্বাস নৃত্যের মাধ্যমে আত্মার দ্বারা শস্যকে ভূমিতে সঞ্চারিত করা যায়। তাদের কাছে নৃত্য হচ্ছে উর্বরতার প্রতীক। তাই প্রতিটি উৎসবের অনিবার্য অনুষঙ্গ হচ্ছে নৃত্য। নৃত্যের আগে সজ্জিত হওয়া ধর্মীয় রীতির অঙ্গ।

বান্দরবানের জেলা সদর সাংগু নদীর ধীরে অবস্থিত। জেলা সদরের কূল ঘেঁষেই রয়েছে চিম্বুক পাহাড়। সাংগু ও মাতামুহুরী নদীর অববাহিকা জুড়ে রয়েছে উঁচু-নিচু পাহাড়ের বেষ্টনী। এসব এলাকা জুড়েই বসতি স্থাপন করেছে এগারটি উপজাতি। তাদের মধ্যে প্রত্যেকেরই রয়েছে স্বতন্ত্র সংস্কৃতি, ভাষা, আচার-অনুষ্ঠান ও ধর্ম। ১৪৩০ খ্রিস্টাব্দে বার্মার গোষ্ঠীগত দাঙ্গার শিকার হয়ে খুমীরা বসবাস শুরু করে বান্দরবানের বোয়াং ছড়ি, রুমা ও থানছির থানায়। খুমীদের আদি নিবাস ছিল বার্মায়। খুমী সমাজে কোনো ছেলে-মেয়ের অবৈধ সম্পর্কের কারণে গর্ভ সঞ্চারিত হলে ৬০টি রূপার মুদ্রা এবং একটি মদ্দা শূকর জরিমানা দিতে হয়।

খুমীরা বছরে দুইবার নবান্ন উৎসব পালন করে। প্রথম পূজা অনুষ্ঠিত হয় জুন-জুলাই মাসে, যাতে জুমের ফসল ভালো উৎপন্ন হয়। এই উৎসবের সময় তারা দেবতার উদ্দেশ্যে ঝিড়ির কাছে গিয়ে শূকর ও মোরগ-মুরগী বলিদান করে। আবার বছরের শেষে যখন জুমের ফসল ঘরে ওঠে, তখন নবান্ন দেবতাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার জন্য খুমীরা ছাগল, শূকর ও মোরগ-মুরগী বলিদান করে।

খুমীরা নবান্ন পূজাকে বলে 'ওয়াংইয়া'। এই উৎসব চলাকালে খুমী পাড়া দুইদিন বন্ধ থাকে। এ সময় পাড়াবাসীদের বাইরে যাওয়া বন্ধ থাকে। বাইরের লোককেও পাড়ার ভেতরে প্রবেশ করতে দেয়া হয় না। নবান্ন উৎসব চলাকালে খুমী মেয়েরা পিঠা তৈরিতে ব্যস্ত থাকে। পিঠার পাশাপাশি চলতে থাকে শূকর ও মোরগ-মুরগীর মাংস খাওয়া ও মদ্যপান।

একসময় খুমী মেয়েদের মধ্যে আঠার ইঞ্চি প্রস্থ 'নিনা' নামে এক ধরনের বস্তু পরিধানের রীতি প্রচলিত ছিল। এর প্রচলন উঠে যাবার পর খুমী মেয়েরা পরিধান করে 'থামি'। আগে পুরুষরা পরত নেংটি। সেই চল উঠে যাবার পর পরিধান করে লুঙ্গি। খুমী সমাজে নারী-পুরুষ উভয়ে পাগড়ি পরিধান করে।

কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের সময় খুমীরা গো-হত্যার অনুষ্ঠান করে। সমগ্র সমাজ মিলে এই অনুষ্ঠান উপভোগ করে। এই উৎসবে সকল নারী-পুরুষ মেতে ওঠে। তারা বনের মধ্যে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে বাঁশি, ঢোল ও অন্যান্য বাজনা বাজিয়ে আরণ্যক পরিবেশকে মুখর করে তোলে।

খুমীরা প্রকৃত পূজারী। তারা গৃহপূজা, তৃণ পূজা ও পাথর পূজা করে। তবে তারা নিজেদেরকে মনে করে বৌদ্ধ। ১৯৮৫-৮৬ সালে কিছু খুমী ক্রামা ধর্ম গ্রহণ। কিছু খুমী গ্রহণ করে খ্রিস্টান ধর্ম।

খুমী সমাজে পরিবারের কোনো লোক মারা গেলে তারা একটি কুকুর, একটি শূকর ও একটি মুরগী হত্যা করে। তারা ঘরে চার-পাঁচ দিন লাশ রাখে। এ সময় তারা ঢাক-ঢোল বাজাতে থাকে। তখন পাড়াপ্রতিবেশীরা নিজেদের কাজ বন্ধ রেখে স্বজন হারানো পরিবারের বাড়িতে জমায়েত হয়। মৃত ব্যক্তির স্মরণে তারা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এবং একটি গরু হত্যা করে। সকলে মিলে এক ভোজসভায় মিলিত হয়। মৃত ব্যক্তির অনুষ্ঠানে অবশ্যই মামা গোত্রের লোক উপস্থিত থাকে। মূলত মামারাই এই অনুষ্ঠানের আয়োজক। অনুষ্ঠানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চলে মদ্য পান।

অধিকাংশ খুমী পরিবারে কুকুর দেখতে পাওয়া যায়। তাদের কাছে কুকুরের মাংস খুব প্রিয়। এমনকি সাপ খাওয়ার রীতিও তাদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। খুমী উপজাতির মানুষ খুবই সাহসী এবং কঠোর পরিশ্রমী। খুমীরা সংখ্যায় কম বলেই তাদের মধ্যে ঐক্য খুব দৃঢ়। মানবিক সাহস প্রকাশের জন্য তাদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে যুদ্ধনৃত্য। খুমী শিল্পীরা দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে এই নৃত্য পরিবেশন করে। উভয় পক্ষের সর্দারের হাতে থাকে ঢাল ও তলোয়ার। উভয় পক্ষের তরুণরা হাত ধরাধরি করে বাঁশি বাজায় এবং তরুণীরা ই-হু-হু-উ আনন্দ ধ্বনি উচ্চারণ করে। যুদ্ধনৃত্যে খুমী সর্দারের মাথায় থাকে লাল কাপড় এবং পাগড়িতে গোজা থাকে বন্য পাখির পালক। খুমীরা নিজেরাই গাছের ছাল-পাকড়া, বাঁশ কিংবা চামড়া দিয়ে ঢাল তৈরি করে। যুদ্ধনৃত্যে ব্যবহৃত অস্ত্রটি লম্বা দায়ের মতো, যা দিয়ে মস্তক ছিন্ন করা যায়। নৃত্যানুষ্ঠানের সঙ্গে বাজানো হয় ঢোল ও গঙ্গ নামক বাদ্যযন্ত্র। পুরো অনুষ্ঠানটির মধ্যে থাকে সাজ সাজ রব।

খুমী তরুণীরা চুলের খোপা বেঁধে এবং কাঁধ ও কোমর পর্যন্ত আড়াআড়িভাবে লাল কাপড় বেঁধে নৃত্যানুষ্ঠানে অংশ নেয়। দুই পক্ষের আক্রমণাত্মক ভঙ্গিই হচ্ছে নৃত্যের প্রাণ।

মারমাদের বসবাস রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে। তারা আদি জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির ধারক। আধুনিক মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি তাদের জীবনে গভীর দাগ ফেলতে পারেনি। তাদের মধ্যে গোত্র বিভাগ রয়েছে। তাদের পরিবার পিতৃতান্ত্রিক। তবে বেশিরভাগ গৃহকর্ম মহিলারা করে থাকেন। মহিলারা গৃহস্থালী কাজকর্ম ছাড়াও কৃষিকাজ ও বাজার হাট করে।

মারমা মেয়েরা পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালোবাসে। তারা চুলের পরিচর্যার বেশ যত্নবান। তাদের মধ্যে রয়েছে উচু করে খোঁপা বাঁধার রীতি। মারমা মেয়েদের প্রচলিত পোশাক হচ্ছে লুঙ্গি ও এ্যানিজা। তারা চুড়ি, বালা, বাজুবন্দ, কানবালা ইত্যাদি অলঙ্কার পড়ে। মারমাদের গৃহদেবতার নাম 'চুমুংলে'। তার সন্তুষ্টির জন্য মারমারা বিয়ের আগে পশু

বলি দেয়। মারমা সমাজে পুরোনো বছরকে বিদায় এবং নববর্ষকে বরণ করে নেয়ার জন্য পালন করে 'সাঙ্গাই' উৎসব। এই উৎসবে অনুষ্ঠিত হয় তাদের ইতিহ্যবাহী 'পানি খেলা'।

মারমারা বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। বৌদ্ধ মতে, প্রত্যেক পূর্ণিমা-ই পবিত্র। এ কারণে তাদের অধিকাংশ পূজা-পার্বণই পূর্ণিমার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। তারা মাঘ মাসের পূর্ণিমাকে 'তাবুং লারে' বলে। এ সময় বুদ্ধদের নাকি ভ্রমণে বের হয়েছিলেন। এর স্মরণে তারা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে মাঘীপূর্ণিমা পালন করে।

অন্যান্য উপজাতির মতো তঞ্চঙ্গ্যাদের প্রধান পেশা জুম চাষ। তাদের জীবন ও সংস্কৃতি জুমচাষকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। তারা ঐক্যবদ্ধভাবে চাষ করে এবং জীবনকে উপভোগ করে। পাহাড় পরিষ্কার করা শুরু হয় অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে। চৈত্রের শেষে আগুন দেয়া হয়। এরপর বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করে তঞ্চঙ্গ্যারা। বৈশাখের প্রথম বৃষ্টি যখন পাহাড়ের মাটি নরম করে দেয়, তখন তারা নরম মাটিতে ছিটিয়ে দেয় ধানসহ নানা ফসলের বীজ। শ্রাবণ মাসে ধান পাকতে শুরু করে। তখন তঞ্চঙ্গ্যারা তাগ নামে এক ধরনের বাঁশের ফালা দিয়ে পশু-পাখি তাড়ায়। একইভাবে পশু পাখি তাড়াতে তারা ব্যবহার করে 'ধুরুক' নামের এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র। একখণ্ড বাঁশের দু'দিকে গিরা রেখে কিছুটা বুক কেটে 'ধুরুক' নির্মাণ করা হয়। তঞ্চঙ্গ্যারা 'ধুরুক' বাজিয়ে একজন শিকারী আরেক জন শিকারীকে খোঁজ করে। তরুণ তার অন্তরের আহ্বান তরুণীর কাছে পৌঁছে দেয় ধুরুকের মাধ্যমে। 'ধুরুক'-এর ধ্বনি উদ্দীপনামূলক। কথিত আছে, একসময় তঞ্চঙ্গ্যারা 'ধুরুক' বাজিয়ে যুদ্ধ করত। এখন তারা রাতের বেলা 'ধুরুক' বাজিয়ে বন্য পশু তাড়ায়।

তঞ্চঙ্গ্যারা মূলত বৌদ্ধ। প্রাচীনকালে তারা মারমাদের সঙ্গে বসবাস করত। ফলে তাদের জীবনে মারমা সংস্কৃতির প্রভাব রয়েছে। অন্যদিকে তাদের জীবনে সনাতনী ধর্মের প্রভাবও রয়েছে। তারা ভূত পূজা, চুমলাং পূজা, সিন্নিপূজাসহ অন্যান্য পূজা করে এবং পশু বলি দেয়।

একসময় তঞ্চঙ্গ্যারা পার্বত্য চট্টগ্রামের গভীর অরণ্যে বসবাস করত। তাদের বসতির কাছে হাট-বাজার ছিল না। তাই তারা নিজেদের জিনিস নিজেরাই তৈরি করত। তারা কচি বাঁশ আগুনে পুড়িয়ে ছাই শোধন করে তৈরি করত লবণ। কেরোসিনের পরিবর্তে ব্যবহার করত গর্জনের তেল। মহিলারা এক প্রকার জংলি গাছের ছাল সিদ্ধ করে মাথার চুল পরিষ্কার করত।

উপজাতীয় মেয়েদের মধ্যে তঞ্চঙ্গ্যাদের পোশাকই সবচেয়ে বেশি বৈচিত্র্যপূর্ণ। তারা পাঁচখণ্ড কাপড় পরিধান করে। চাকমাদের মতোই তঞ্চঙ্গ্যাদের পরনের কাপড়ের নাম পিনন। এর কোনো কাবুকি (আঁচল) নেই। জমিন লাল রঙের ডোরা কাটা; উপরে ও নিচে কালো রঙের বর্ডার। পিননে কোনো সেলাই থাকে না। তারা নিজেদের

বক্ষবন্ধনী অর্থাৎ ফুলখাদি কিংবা রাঙাখাদি নিজেরাই কোমর তাঁতে তৈরি করে। তঞ্চঙ্গ্যারা মাথায় কাপড় পরে। তারা নিজেদের পিনন শক্ত করে বেঁধে রাখার জন্য হালকা রঙের কোমরবন্ধনী ব্যবহার করে, যার নাম 'ফা-ধরি'। এছাড়া তারা পরিধান করে কোমরতাঁতে বোনা ফুলহাতার জামা। তাকে বলা হয় 'জুম্মাছিলুম'। এসব কাপড়ে তঞ্চঙ্গ্যা রমণীদের সারা শরীর আচ্ছাদিত থাকে। অন্যান্য উপজাতিদের চেয়ে তাদের পোশাক আলাদা। তঞ্চঙ্গ্যারা জুম চাষকে কেন্দ্র করে নৃত্যগীতের আয়োজন করে থাকে। এ ধরনের একটি নৃত্যগীতের নাম 'জুমনাচ'। এই লোকনৃত্যটি চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে যারা শিক্ষিত জনগোষ্ঠী, তাদেরই সৃষ্টি। তবে এতে ব্যবহৃত হয় চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যাদের জীবন সংগ্রামের বাস্তবচিত্র। পাঁচের অধিক নৃত্যশিল্পী এতে অংশ নেয় এবং জুম চাষের ইতিবৃত্ত ফুটিয়ে তোলে। এই গীতিনৃত্যের মধ্যে রয়েছে পাহাড়ে জুম চাষ থেকে শুরু করে পিঠের ঝুড়িতে করে ফসল ঘরে আনা পর্যন্ত বিভিন্ন চিত্রকল্প। লোকনৃত্যের শিল্পীরা নাচের তালে তালে গান গেয়ে দর্শকদের আনন্দ দেয়। এই নৃত্যনাট্যে তঞ্চঙ্গ্যা শিল্পীরা পরিধান করে তাদের ইতিহ্যবাহী পোশাক পিনন ও রাঙাখাদি। তারা চাকমাদের 'জুমনাচ'-এর অনুসরণে নৃত্যনাট্যটি তৈরি করেছে। তবে এর পরিবেশনের রীতি অনেকটা পৃথক।

তঞ্চঙ্গ্যা ও চাকমাদের ভাষার শেকড় এক জায়গায়। চাকমা ভাষার মধ্যে যেমন অনেক বাংলা শব্দ আছে, তেমনি তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায়ও অনেক বাংলা শব্দ আছে। দুই উপজাতির হরফেই বার্মিজ প্রাধান্য আছে। ধনপুদি রাধামন পালা, চাদিগাং ছাড়া পালা, উভাগীত, বিভিন্ন বারমাসী, চাকমা কবি শিবচরণের 'গোজেনের লামা' ইত্যাদি গ্রন্থ তঞ্চঙ্গ্যাদের কাছে অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। ভাষা তাত্ত্বিকদের অনুমান, পালি ও প্রাকৃত থেকে তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় উৎপত্তি হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, তঞ্চঙ্গ্যা ভাষার জন্ম বাংলা ভাষার সূতিকাগারে।

তঞ্চঙ্গ্যাদের নিজস্ব ভাষায় বহু গান প্রচলিত রয়েছে। এসব গান 'জুমিয়া বাঁশি', 'ধুরুক' ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র সহকারে গীত হয়ে থাকে। চাকমা ভাষার তুলনায় তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় আরাকানী ভাষার অনুপ্রবেশ ঘটেছে অনেক বেশি।

মারমা নৃত্য

মারমা সমাজের শ্রেষ্ঠতম অভিব্যক্তি হচ্ছে মারমা নৃত্য। তারা দলগতভাবে সৃষ্টি করে নৃত্যের মুদ্রা, তাল, ছন্দ ও লয়। তাদের নাচের বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে অপদেবতাকে তুষ্ট করণ, বৃষ্টির আহবান, রোগ-মহামারি থেকে মুক্তির প্রার্থনা, জুমচাষের আনুষ্ঠানিকতা, স্বাপদ সঙ্কুল অরণ্যের বিপদ থেকে মুক্তির জন্য নিজেদেরকে নিবেদন প্রভৃতি।

মারমাদের নৃত্য হচ্ছে তাদের সহজাত শিল্প এবং জীবন সংস্কৃতিরই অংশ। মারমা সমাজে নৃত্য রচিত হয় যৌথভাবে। এ কারণেই তাদের নৃত্য দুই ধরনের। একটি ধর্ম

ভিত্তিক, অন্যটি সামাজিক। ধর্মভিত্তিক নৃত্যের মধ্যে রয়েছে বুদ্ধের উপাসনা, ধর্ম ও সংঘের আরতি, দেবতা অপদেবতার পূজা, পশু শিকার, শস্য উৎপাদন, বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, মৃত আত্মার আহ্বান ইত্যাদি। সামাজিক নৃত্যের মধ্যে রয়েছে জন্ম, বিয়ে, সংস্কার ও জয়-পরাজয় সম্পর্কিত নৃত্য।

সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তি ও পুরোহিত মারা গেলে তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় 'সইং আকাহ' ও 'ডুং আকাহ' নৃত্য পরিবেশিত হয়ে থাকে। পশু শিকারের অনুকরণে যে নৃত্য পরিবেশিত হয় তাকে বলা হয় 'ক্যাহ আকাই', 'বিলু আক্কা' 'নাগাহ আক্কা' 'উধং' ইত্যাদি।

মারমা সমাজে 'ছুমুই খোয়ও আকা' নামে একটি নৃত্য প্রচলিত রয়েছে। এটি হচ্ছে এক ধরনের প্রদীপ নৃত্য। সাধারণত মারমা তরুণীরা এই নৃত্য পরিবেশন করে। তারা দুটি ছোট বাটিতে প্রদীপ জ্বেলে করতলে ধরে রাখে। এরপর নৃত্য পরিবেশন করে। পূজা-পার্বণে এই নৃত্য পরিবেশিত হয়। মারমারা 'ক্যাং'-এ গিয়ে প্রদীপ নৃত্যের মাধ্যমে ভগবান বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। এই নৃত্যের সঙ্গে মারমা উপজাতির ধর্মীয় সংস্কার জড়িত বলে অন্য উপজাতিরা এই নৃত্যে অংশ নেয় না।

মারমা উপজাতীয় সমাজে কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হলে মারমারা 'সইং' নৃত্য পরিবেশন করে। প্রাচীনকালেও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে এই ঐতিহ্যবাহী নৃত্য পরিবেশিত হতো। 'সইং' পরিবেশনের জন্য পারদর্শী দল থাকে। তারা রথযাত্রায়ও 'সইং' নৃত্য পরিবেশন করে। মারমারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তাদের আচার-অনুষ্ঠানে আরাকান ও বার্মার বৌদ্ধদের প্রভাব রয়েছে। 'সইং' নৃত্যের মধ্যেও এই প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। রাজা বা অন্য কোনো মহান ব্যক্তির মৃত্যু হলে মারমারা রাজার মরদেহ রথে বহন করে নিয়ে যায়। এ সময় শিল্পীরা 'সইং' নৃত্য পরিবেশন করে। নৃত্য দলে থাকে ১৫ থেকে ২৫ জন নৃত্যশিল্পী। নৃত্যদল কাঠি হাতে এই নৃত্য পরিবেশন করে।

মারমা উপজাতির মধ্যে 'লংবাই আকা' নামে একটি নৃত্যের প্রচলন রয়েছে। মারমা ভাষায় 'লংবাই' অর্থ থালা এবং 'আকা' মানে নৃত্য। এর বাংলা অর্থ 'থালানৃত্য'। মারমাদের মধ্যে লোকনৃত্য হিসাবে 'থালানৃত্য'টি পরিচিত। মারমারা রাজার অভিষেক অনুষ্ঠানে এই নৃত্য পরিবেশন করে। ঢোল ও মাদলের তালে তালে থালা হাতে এই নৃত্য পরিবেশন করেন শিল্পীরা। 'থালানৃত্য' অনেকটা মণিপুরী নৃত্যের মতো।

মারমা উপজাতির মধ্যে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য পুরাণের গল্প, লোককাহিনী ও রূপকথা। এগুলো হচ্ছে তাদের সংস্কৃতির ভাণ্ডারে অমূল্য সম্পদ। তারা পরীদের কাহিনী নিয়ে পরিবেশন করে 'নে-সমুই' নৃত্য। 'নে-সমুই' অর্থ পরীনৃত্য। মারমা সমাজে প্রচলিত 'মঁনর মাসুমি' পরীর কাহিনী অবলম্বনে রচিত একটি 'পরীনৃত্য' পরিবেশিত হয়। এর নেপথ্যে সংক্ষিপ্ত ধারা বর্ণনা থাকে। নৃত্যে অংশ নেয় সাতজন তরুণী। তাদের

পেছনে ডানা লাগানো হয়। তারা আকাশ থেকে নেমে আসে। ঢোলের তালে তালে পরীরা নাচে। তাদের সামনে উপস্থিত হয় শিকারী আর রাজপুত্র। মারমাদের মধ্যে পরীনৃত্য বেশ জনপ্রিয়।

মারমা সমাজে আধুনিক নৃত্যের ঢঙে পরিবেশিত হয় বিভিন্ন লোকনৃত্য। এর সঙ্গে সমতল ভূমির মানুষের লোকনৃত্যের মিল রয়েছে। কিন্তু তাদের নৃত্য পরিবেশিত হয় ভিন্ন পরিবেশে। মারমাদের আরেকটি নৃত্য হচ্ছে 'মাছ ধরা নৃত্য'। এই নৃত্যে তাদের জীবনচিত্র রয়েছে। পাহাড়ি অধিবাসীরা দল বেঁধে পাহাড়ের পাদদেশে ও বিলে ছোট ছোট মাছ ও কাঁকড়া ধরে। এই অভিজ্ঞতাকেই তারা ফুটিয়ে তোলে 'মাছ ধরা নৃত্যে'। মনে হয় নৃত্যটি সমতল ভূমির লোকসমাজ থেকে মারমা সমাজে প্রবেশ করেছে। এর সঙ্গে বাংলা জেলে নৃত্যের মিল রয়েছে।

মারমা সমাজে প্রচলিত রয়েছে 'মুখোস নৃত্য'। এ ধরনের নৃত্য প্রতিটি প্রাচীন সমাজে প্রচলিত ছিল। সাধারণ মানুষ বিভিন্ন বন্য প্রাণীর মুখোস পরে এই নৃত্যে অংশ নিত। এসব মুখোসের মধ্যে ছিল বাঘ, সিংহ, ভাল্লুক, বানর, ভূত-প্রেত ইত্যাদির মুখোস। মারমারা মনের ভয় দূর করার জন্য মুখোস নৃত্য পরিবেশন করে। তারা মুখোস নৃত্যকে বলে বুলু'। 'বুলু' নৃত্যটি পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। এটি হচ্ছে একক শিল্পীর নৃত্য। মারমারা সাধারণত বাঘ সেজে এই নৃত্য পরিবেশন করে।

মারমা সমাজে অত্যন্ত জনপ্রিয় নৃত্য হচ্ছে 'পাঙ্খু'। 'পাঙ্খু' শব্দের অর্থ কীট, পিঁপড়া বা মাকড়সা। সম্ভবত এসব কীট-পতঙ্গের সারিবদ্ধ চলন থেকে সৃষ্টি হয়েছে পাঙ্খু নৃত্যের ছন্দ ও তাল। এটি ধীর লয়ের সারিবদ্ধ নৃত্য। এই নৃত্যে বসা কিংবা দাঁড়ানো অবস্থায় কাঁধ, নিতম্ব, হাঁটু ও হাতের সঞ্চালন দেখানো হয়। সীমিত কয়েকটি মুদ্রার মধ্যে এর মাত্রা সীমাবদ্ধ। 'পাঙ্খু' নৃত্যে কয়েকটি সাধারণ মুদ্রা ও ভঙ্গির মাধ্যমে হাতের রুমাল দিয়ে দেখানো হয় নিসর্গের লীলা চঞ্চল রূপ, ঝর্ণার অবগাহন কিংবা কলস থেকে পানি গড়ানোর দৃশ্য। 'পাঙ্খু' নৃত্যে ব্যবহৃত হয় হারমোনিয়াম, ক্লানেট ও ব্যান্ড বাদ্যযন্ত্র। গভীর অরণ্যের আলো-ছায়ার মধ্যে 'পাঙ্খু' নৃত্যের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় বিমূর্ত শিল্পের মূর্ত রূপ।

উপজাতিদের বর্ষ বিদায় এবং বর্ষবরণ উৎসব

চাকমারা পুরোনো বছরকে বিদায় এবং নতুন বছরকে বরণ করে নেয়ার জন্য পালন করে 'বিজু' উৎসব। এ ব্যাপারে তারা বঙ্গাব্দকে অনুসরণ না করলেও 'বিজু' উৎসবের সঙ্গে বাংলাদেশের চৈত্র সংক্রান্তি এবং বর্ষবরণের তারিখ মিলে যায়। বাংলা সনের শেষ দিন হচ্ছে চৈত্র সংক্রান্তি এবং পরের দিনই বাংলা নববর্ষ অর্থাৎ ১লা বৈশাখ। চাকমারা চৈত্র সংক্রান্তি পালন করে দুই দিন। চৈত্রের শেষ দু দিনের উৎসবের নাম যথাক্রমে 'ফুলবিজু' এবং 'মূলবিজু'। তারা ১লা বৈশাখকে আখ্যায়িত করে 'গর্যাপর্যা' হিসাবে। এই হিসাবে তাদের 'বিজু' উৎসব চলে তিনদিন।

চাকমারা বিজু উৎসবে ভগবান বুদ্ধকে স্মরণ করার জন্য মন্দির প্রদক্ষিণ করে। এই উৎসবের মাধ্যমে তরুণ-তরুণীরা নিজেদের জীবনসঙ্গী খুঁজে নেয়। বিজু উৎসবের প্রধান আনন্দদায়ক দিক হচ্ছে নৃত্যগীত পরিবেশন। চাকমা মেয়েরা তাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পিনন (পরনের কাপড়), রাঙাখাদি (বক্ষ বন্ধনী) এবং চন্দ্রহার, হাঁসুলি প্রভৃতি অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে নৃত্যে অংশ নেয়। ছেলেরা পরিধান করে ধুতি, গামছা 'জুম্মাদিলুম' (জামা) ও খরং (পাগড়ি)। চাকমারা নৃত্যগীতের মাধ্যমে বুদ্ধের কাছে সুখী জীবনের বর প্রার্থনা করে। তঞ্চঙ্গ্যা উপজাতি একই ভাবে নববর্ষ উদযাপন করে।

তঞ্চঙ্গ্যাদের প্রার্থনা ঘরের নাম 'কেয়াং'। তারা 'কেয়াং'-এ গিয়ে ভগবান বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে। এরপর নৃত্যের তালে তালে 'কেয়াং' প্রদক্ষিণ করে। তঞ্চঙ্গ্যারা তাদের ধর্মীয় নৃত্যের অনুসরণে 'জাদি' নামে একটি নৃত্যনাট্যের সৃষ্টি করেছে। তারা তাদের প্রার্থনা ঘর 'কেয়াং' বা 'জাদি'র অনুকরণে বাঁশ ও কাপড় দিয়ে জাদি নির্মাণ করে। জাদিকে ঘিরেই অনুষ্ঠিত হয় তাদের এই নৃত্যগীত। এই নৃত্যের আবহ সংগীত সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত হয় বাঁশি ও ঢোল। চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা উপজাতি ছাড়াও মারমা, ত্রিপুরা, উসুই প্রভৃতি উপজাতির মধ্যে চৈত্র সংক্রান্তি এবং নববর্ষ উদযাপনের রেওয়াজ রয়েছে।

ত্রিপুরা উপজাতির মানুষ চৈত্র সংক্রান্তি ও নববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে 'গরাইয়া' গীতনৃত্যের আয়োজন করে। অনির্দিষ্ট সংখ্যক নারী-পুরুষ 'গরাইয়া' নৃত্যগীতে অংশ নেয়। ত্রিপুরা নৃত্যশিল্পীরা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে 'গরাইয়া' নৃত্যগীত পরিবেশন করে। যে বাড়ি থেকে 'গরাইয়া' নৃত্যগীত শুরু হয় সে বাড়িতে গিয়েই শেষ হয়। ত্রিপুরার চৈত্র সংক্রান্তির প্রথম দিনে যে উৎসব পালন করে তাকে বলে 'হারিবিষু' এবং চৈত্রের শেষ

দিনের উৎসবকে বলে 'বিষু' উৎসব। 'হারিবিষু'র মধ্যরাতে 'গরাইয়া' নৃত্যগীতের শুরু হয়। সেদিনই তারা 'গরাইয়া' দেবতার পূজা করে। 'গরাইয়া' নৃত্যগীতের প্রধান চরিত্র হচ্ছে 'বাই' বা ঢোলবাদক। ঢোলের বিচিত্র বোলের উপরই 'গরাইয়া' নৃত্যগীতের তাল ও মুদ্রার পরিবর্তন ঘটে। নৃত্যগীত পরিচালনা করেন 'আচাই'। তার পরনে থাকে সাদা রমতৈ (ধুতি), সাদা কুবাই (জামা), সাদা পাগড়ি এবং লাল কোমরবন্ধনী। তার হাতে ধরা থাকে একটি ত্রিশূল। ত্রিশূল হাতে নৃত্যরত 'আচাই'-কে ঘিরে ডান থেকে বামে ঘুরে ঘুরে শিল্পীরা ঢোলের তালে তালে নাচেন। শিল্পীরা নৃত্যগীত পরিবেশনের মাধ্যমে সমাজ জীবনের বত্রিশটি চিত্রকল্প ফুটিয়ে তোলেন। এসব চিত্রকল্পের মধ্যে রয়েছে পাহাড়ে জঙ্গল কাটা, আগুন লাগানো, শস্য রোপন, পাখি তাড়ানো, ফসল কাটা, কাপড় বোনা, চরকাকাটা, গৃহস্থালী কাজ, তরুণ-তরুণীর অভিসার ইত্যাদি। 'আচাই' গৃহস্থ বাড়ির উঠানে গিয়ে বাড়ির সামনে ত্রিশূলটি পুঁতে রাখেন। তখন গৃহস্থ পরিবার নিজেদের মঙ্গল কামনায় 'গরাইয়া' দৈবতার নামে মোরগ, চাল, মদ, টাকা ইত্যাদি 'আচাই'-র হাতে তুলে দেয়। 'গরাইয়া' নৃত্যগীত অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বর্ষবরণ এবং সবার জীবনে মঙ্গল কামনা। ত্রিপুরা উপজাতির কাছে 'গরাইয়া' বা শিব আকাশ দেবতার প্রতীক। নাচে ব্যবহৃত ত্রিশূলটি হচ্ছে শিবের অনুপস্থিতির প্রতীক। 'গরাইয়া' দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত 'গরাইয়া' নৃত্যগীত একনাগাড়ে কয়েক দিন চলে।

সাঁওতাল সমাজ নববর্ষ উদযাপন করে ফাল্গুন মাসে। এই উৎসবের প্রাণ সম্পদ হচ্ছে নৃত্যগীত। ফাল্গুন মাসে অনুষ্ঠিত উৎসবের নাম 'ফাগুয়া'। সাঁওতালী ভাষায় একে বলে 'বাহা'। 'বাহা' শব্দের অর্থ পুষ্প। বসন্তের আগমনে বনে বনে ফুল ফোটে। সাঁওতাল তরুণ-তরুণীদের মন রেঙে ওঠে বিচিত্র ফুলের রঙে। এই উৎসবের সময় সাঁওতাল মেয়েরা খোঁপায় ফুল পরে। এই উৎসবের আগে ফুল ব্যবহার নিষিদ্ধ থাকে। 'ফাগুয়া' উৎসব চলে তিনদিন। এই উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত পূজার খরচ বহন করে সকলে মিলে। পূজা অনুষ্ঠিত হয় অরণ্যের মধ্যে। পূজাতে ব্যবহৃত হয় শালফুল। তরুণ-তরুণীরা নৃত্যগীত পরিবেশনের মাধ্যমে পুরো পরিবেশ-মুখর করে তোলে। সাঁওতালদের ধর্ম ও সংস্কৃতি একই সূত্রে গাঁথা। তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান নৃত্যগীত ছাড়া হয় না।

বৈসুক, সাংগ্রাইং ও বিজু একই উৎসবের ভিন্ন ভিন্ন নাম। চৈত্র সংক্রান্তি শেষে নববর্ষ বরণ উৎসবের নামই হচ্ছে সাংগ্রাইং। এটি মারমাদের সবচেয়ে বড় উৎসব। তিন দিনব্যাপী এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মারমারা সাংগ্রাইং উৎসবের মাধ্যমে তাদের সমাজে প্রচলিত বিশ্বাসের প্রকাশ ঘটায়। এই উৎসবের মাধ্যমেই মারমা সমাজ তাদের জলবায়ু, আবহাওয়া, কর্মক্ষেত্র, ভাগ্য ও ব্যবসা-বাণিজ্যের পূর্বাভাষ দেয়। রাজকীয় কায়দায় অপশক্তি ও আধ্যাত্মিক শক্তিকে পূজা করে সন্তুষ্ট করা হয়।

ক্য শৈ প্রু 'সাংগ্রাইং' শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে লিখেছেন 'সাংক্রাইং' শব্দ থেকে 'সাংগ্রাইং' শব্দের সৃষ্টি হয়েছে। মারমা বর্ষপুঞ্জি অনুসারে 'মারমা সাল গণনাকে'গঃ জাঃ সাকরাই' বলা হয়ে থাকে। বুদ্ধাব্দ, খ্রিস্টাব্দ, হিজরি ও বঙ্গাব্দ প্রচলনের পর পরই গঃ জাঃ সাকরাই সন প্রচলন হয়। মারমা বর্ষপুঞ্জি চন্দ্র মাস অনুসরণে প্রচলিত হয়েছে। মারমাদের আচার-অনুষ্ঠান, উপবাস যাপন, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা চান্দ্র মাসকে ঘিরে আবর্তিত।

মারমা বর্ষপুঞ্জিতে রয়েছে বারটি চান্দ্র মাস এবং তিনটি ঋতু। তিনটি ঋতুর মধ্যে রয়েছে বর্ষা, গ্রীষ্ম ও শীত। 'সাংগ্রাইং' এর আগমনী সংবাদ প্রকাশিত হয় বর্ষ শুরুর আগেই। প্রতি বছর মায়ানমার থেকে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয় মারমাদের পুঞ্জিকা। মারমাদের বার্ষিক পুঞ্জিকার নাম 'সাংগ্রাইং জা'। 'সাংগ্রাইং জা'-তে থাকে এক বছরের নক্ষত্রের অবস্থান এবং মঙ্গল-অমঙ্গলের প্রভাবক রাশির হিসাব-নিকাশ। এর আলোকেই প্রতি বছর মারমারা চাষ-আবাদ, বর্ষ বিদায়, বর্ষ বরণসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন করে। 'সাংগ্রাইং জা'-তেই উল্লেখ থাকে শুভ-অশুভ দিন, অমাবস্যা-পূর্ণিমা, চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ ইত্যাদি ভবিষ্যৎ বাণী। 'সাংগ্রাইং' হচ্ছে জুম কেটে শুকানো ও পোড়ানোর সর্বশেষ সময়কাল। 'সাংগ্রাইং'-এর আগে মারমারা অবশ্যই জুম পোড়ানোর কাজ শেষ করে থাকে। 'সাংগ্রাইং' পর্বের প্রথম দিবসকে বলে 'পাইংছোয়াই'। এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে ফুল তোলা।

মারমাদের কাছে ফুল খুব পবিত্র। তারা পূজার জন্য গোলাপ, জবাসহ নানা সুগন্ধী ফুল সংগ্রহ করে। প্রত্যেক মারমা গৃহে থাকে বেদীতে বুদ্ধের মূর্তি। তাকে ফুল দিয়ে প্রণাম করে মারমারা। 'সাংগ্রাইং'-এর প্রথম দিবসে মারমা নিজগৃহ, বিহার এবং বুদ্ধের বেদী থেকে পুরোনো ফুল অপসারণ করে। এর স্থলে অর্পণ করে তরতাজা ফুল, পুষ্পমাল্য, পুষ্পস্তবক, পুষ্পদানি ইত্যাদি। তাজা ফুলের গন্ধে মৌ মৌ করে বেদীপ্রাঙ্গণ। এদিনই প্রবীণরা অষ্টশীল ও উপবাসের জন্য বৌদ্ধ বিহারে গমন করে এবং সেখানে তিন দিন থাকে।

'পাইংছোয়াই' দিবসের ব্যাপ্তি হচ্ছে ভোর রাত থেকে পরবর্তী ভোর রাত পর্যন্ত। এদিনের ধর্মীয় কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে বুদ্ধ পূজা, প্রদীপ পূঁজা, পঞ্চশীল ও অষ্টশীল গ্রহণ, শ্রমণ, পিণ্ড দান, ভোজন সম্পাদন, বুদ্ধ স্নান, ধ্যান-বন্দনা-প্রার্থনা, বিশ্রাম ও নিদ্রা ইত্যাদি।

'সাংগ্রাইং' উৎসবের দ্বিতীয় দিনে ধর্মাচার অনুসারে প্রবীণদের পূজা করা হয়। তাদের প্রতি নিবেদন করা হয় পুষ্পার্ঘ্য। প্রবীণরা আগত পূজারীদের প্রতি আশির্বাদ বাণী বর্ষণ করে। এদিনই তারা স্থাপন করে 'পদেবা বাং' অর্থাৎ কল্পতরু এবং 'তরবোয়ে' অর্থাৎ সম্প্রদানপাত্র। কল্পতরুতে ঝোলানো হয় দানের টাকা এবং সম্প্রদান পাত্রে রাখা হয় রঙিন কাগজ শোভিত কলা, নারকেল ইত্যাদি। ফলের সঙ্গে থাকে

মোমবাতির প্যাকেট। মারমারা এগুলো সমর্পণ করে বৌদ্ধ বিহারে। তারা প্রার্থনা করে এর ফল যেন তারা অনন্ত কাল ধরে পায়। 'তরবোয়ে' এবং 'পদেসা বাং' অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে নেই। 'সাংগ্রাইং' এর তৃতীয় দিনে ধর্মী আচার-অনুষ্ঠান ছাড়াও মারমারা নেচে ওঠে উৎসবে। এর মধ্যে পানি উৎসব ছাড়া আরেকটি উৎসব হচ্ছে জাহাজ টানার অনুষ্ঠান। জাহাজ টানার উৎসব করার জন্য মারমারা বাঁশ, বেত ও রং-বেরঙের কাগজ দিয়ে চাকা সংযুক্ত জাহাজ নির্মাণ করে। মারমা তরুণ-তরুণী ও ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা মারমা গান গেয়ে এবং বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে প্রধান সড়ক দিয়ে বৌদ্ধ বিহারে জাহাজ টেনে নিয়ে যায়। জাহাজে মোমবাতি জ্বালানোর জন্য পথে পথে লোক দাঁড়িয়ে থাকে। তারা আয়োজকদের নগদ অর্থ প্রদান করে। জাহাজের সঙ্গে থাকে এক জোড়া পুতুলরূপী মানুষ। পুতুল দুটি সং সেজে হেলে দুলে নাচে এবং ছুটাছুটি করে।

মারমা ভাষায় পুরুষ পুতুলটিকে বলা হয় ফোকছোরমা এবং নারী পুতুলটিকে বলা হয় বিসর্জন দেয়া হয়। টাকাগুলো রেখে দেওয়া হয় পরবর্তী বছরের উৎসব পালনের জন্য। মারমারা বৌদ্ধ হলেও গরু, শূকর, ছাগল হাঁস-মোরগ, কবুতর বলী দিয়ে দেবদেবীর সন্তুটি বিধান করে।

মারমা সমাজে একটি প্রবাদ প্রচলিত রয়েছে, 'মরণে কুল-জাত-বংশ ধ্বংস হয় না। কুল ধ্বংস হয় রীতি-নীতি-কৃষ্টি বিসর্জন দিলে।' এই প্রবাদ তারা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে এবং রীতি-নীতি-কৃষ্টি রক্ষার ব্যাপারে অনড় থাকে। এ কারণে শত বছরেও তাদের আচার-আচরণ এবং পূজা-পার্বণের পরিবর্তন ঘটেনি।

কালের বিবর্তনে বাঙালিদের চৈত্র সংক্রান্তি এবং বৈশাখী উৎসবের পরিবর্তন ঘটেছে। বৈশাখী উৎসবের অনেক বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হয়েছে। আবার নতুন উপাদান যুক্ত হয়েছে। বৈশাখী উৎসবের চড়ক পূজা কিংবা হালখাতা খোলার রীতি বিলুপ্ত হয়েছে। নতুন উপাদান হিসাবে যুক্ত হয়েছে বটতলার রবীন্দ্র সংগীত এবং মুখোস মিছিল। কিন্তু আদিবাসী মারমাসমাজ 'সাংগ্রাইং' উৎসব উদযাপনের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখেছে। 'সাংগ্রাইং' উৎসব শুধু মারমাদের নৃ-তাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক পরিচয়ই বহন করে না, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিচয়ও বহন করে।

মারমাদের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবন আবর্তিত হয় পাহাড়-পর্বত, নদী-ঝর্ণা, বন-জঙ্গল, জুম চাষ ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে ঘিরে। 'সাংগ্রাইং' উৎসব উদযাপনের মধ্যে সেই জীবন ধারার পরিচয় রয়েছে। এই উৎসবে মারমারা একসঙ্গে মিলে-মিশে গান-বাজনার মাধ্যমে সমাজকে পরিশোধন, সংরক্ষণ ও সৎ কর্মে উদ্বুদ্ধ হবার জন্য আহ্বান জানায়। তারা মহৎ কর্ম সম্পাদনে উদ্যোগী হয়। পুকুর খনন করে, জলাধার নির্মাণ করে, পান্থশালা গড়ে তোলে, বয়স্ক ব্যক্তিদের সেবা-শুশ্রষা করে, জ্ঞানী-গুনী ব্যক্তিদেরকে শ্রদ্ধা জানায়। একই সঙ্গে গ্রামে গ্রামে 'জাইত', 'পাঙ্খু' ইত্যাদি পালাগানের আসর বসায়। 'সাংগ্রাইং' উৎসব সব জায়গায় একই রকম হয় না।

উৎসবের আভিজাত্য নির্ভর করে আর্থিক স্বচ্ছলতার উপর। একটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো, মারমা আদিবাসীদের মধ্যে বার্মিজ সংস্কৃতির ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। কারণ, তারা বার্মিজ বংশোদ্ভূত। অনেক স্থানে 'সাংগ্রাইং' উৎসব উদযাপনে ভাটা পড়েছে। আবার অনেক স্থানে উৎসব আরো জাঁকজমকপূর্ণ হয়েছে। রাঙ্গামাটির কাপ্তাই উপজেলার ডংনালা গ্রামের উৎসব খুব 'জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এখানে উৎসব উদযাপনের বয়স দুইশ' বছরের বেশি পুরোনো। আগে গ্রামের লোকের অবস্থা ভালো ছিল না। ফলে উৎসব ছিল সাধারণ মানের। এই উৎসব এখন আরো জাঁকজমকপূর্ণ হয়েছে।

'সাংগ্রাইং' উদযাপনে বাংলা কিংবা ইংরেজি নববর্ষ উদযাপনের মতো নয়। একটি ব্যতিক্রম রয়েছে। বাংলা কিংবা ইংরেজি নববর্ষ উদযাপিত হয় প্রথম মাসের প্রথম দিনে। কিন্তু 'সাংগ্রাইং' উৎসব বছরের প্রথম মাসের প্রথম দিনে অনুষ্ঠিত হয় না। মারমা পুঞ্জিকায় বছরের পহেলা মাসের নাম 'তাইংখুং'। এই মাসের পয়লা তারিখ হচ্ছে ১৯শে মার্চ কিংবা এর কাছাকাছি একটি সময়। কিন্তু 'সাংগ্রাইং' উৎসব উদযাপিত হয় ১৪ই এপ্রিলের দুইদিন আগ থেকে। এমনকি এই উৎসব বুদ্ধের জন্ম দিবসকে ঘিরেও আবর্তিত হয় না। 'সাংগ্রাইং' একই সঙ্গে ধর্মীয় এবং সামাজিক উৎসব। মারমা ভাষায় একটি কবিতায় আছে 'আকাশ থেকে সাংগ্রাইং এলো/ নেচে উঠল ঠাকুরদি।'

মারমাদের সাংগ্রাইং উৎসবের মূল কথা হচ্ছে জীবনের সমৃদ্ধির স্বপ্নে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নববর্ষকে বরণ করে নেয়া। বোমাং রাজা কিংবা মং রাজা নিজে এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা। রাজা স্বয়ং তার সদর বাড়িতে সাংগ্রাইং উৎসবের আয়োজন করেন। উৎসবের আগে হেডম্যান, গ্রাম কিংবা মৌজা প্রধানদের নির্দেশে শুরু হয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভিযান, পূজা-পার্বণে যোগ দেয়ার আহবান। এই উৎসবে মারমা জনগণ সমবেত হয় তাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে পূজা-অর্চনা ও মঙ্গল প্রার্থনার জন্য। 'সাংগ্রাইং' উৎসবের সময় মারমা সমাজে বেড়ে যায় বৌদ্ধ মন্দিরে আসা-যাওয়া, পূজা-পার্বণ এবং শ্রদ্ধাঞ্জলি দেয়ার ব্যস্ততা। 'সাংগ্রাইং' উৎসব উদযাপনের শুরুতেই মারমাদের ঘরের দরজাগুলো ফুলের মালা দিয়ে সাজানো হয়। এই দিনই মারমারা গৃহপালিত পশুদের পরায় ফুলের মালা, এলাকার সবচেয়ে প্রবীণ ব্যক্তিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানায়, পিঠা তৈরির উপকরণ সংগ্রহ করে। গভীর রাত পর্যন্ত চলে ঐতিহ্যবাহী ঢেঁকির সাহায্যে 'পিঠা তৈরি উৎসব'। এক-একটি এলাকায় চার-পাঁচটি পিঠা তৈরির দল দেখা যায়। এই অনুষ্ঠানে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে গান গেয়ে দলে দলে তরুণ-তরুণীরা মেতে ওঠে। প্রথমেই ভোরবেলায় বৌদ্ধ মন্দিরে পূজার মাধ্যমে পিঠা প্রদান করা হয়। বিকালে শুরু হয় নৌকা বাইচ। এ ছাড়া দ্বিতীয় দিনে চলে বিভিন্ন ধরনের খেলার প্রতিযোগিতা। এসব খেলার মধ্যে রয়েছে পানি খেলা, বলী খেলা, বাঁশ আরোহণ খেলা, বালিশ খেলা ইত্যাদি। তরুণ-তরুণীরা পরিবেশন করে নৃত্যগীতি। মারমা সমাজে 'সাংগ্রাইং' বা চৈত্র

সংক্রান্তির উৎসবের একটি ব্যাপক তাৎপর্য রয়েছে। এর মাধ্যমেই তারা তুলে ধরে তাদের সামগ্রিক জীবন সংস্কৃতি। একটি মারমা গানের শুরুতেই রয়েছে–

ও-ভাই সকলে
ও-বোন সকলে
এসো একত্রে
আনন্দ করি।

'সাংগ্রাইং' উৎসবের দ্বিতীয় দিবসও থাকে খুব আনন্দমুখর। নাট্যগীতিতে পুরো মারমাপাড়া মুখর হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় দিনের ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে পানি উৎসব। এই উৎসবের মাধ্যমে মারমা তরুণ-তরুণীরা নিজেদের মধ্যে নিবিড় ভালোবাসায় আবদ্ধ হয়। এই উৎসবের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে রয়েছে প্যান্ডেল, নৌকা, নৌকা ভর্তি পানি, তরুণীদের জন্য নৌকা বরাবর আসন, পানি ভর্তি বালতিসহ মগ, বাদ্যযন্ত্রসহ গায়ক দল ইত্যাদি। মারমা তরুণরা স্ব স্ব পাড়া থেকে বাদ্যযন্ত্র সহযোগে গান গেয়ে নেচে প্যান্ডেলে সমবেত হয়। তাদের সঙ্গে থাকে খালি বালতি ও পানির পাত্র। প্যান্ডেলে আসার পর তরুণীরা তাদের দিকে তাকায় না। প্যান্ডেল এসে তরুণরা পানি কিনে নেয়, খেলার অংশ হিসাবে। প্রত্যেক তরুণ তার পছন্দসই একজন তরুণীর পিঠে পানি নিক্ষেপ করে। দুই-তিন বার পানি নিক্ষেপের পর তরুণী উঠে দাঁড়ায় এবং নৌকা থেকে পানি নিয়ে তরুণের দিকে প্রীতি বিনিময় সূচক পানি নিক্ষেপ করে। বালতির পানি শেষ না হওয়া পর্যন্ত পানি নিক্ষেপণ চলতে থাকে। আবার পানি সংগ্রহ করে একই ধরনের খেলা চালাতে থাকে। এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তরুণ-তরুণীদের মধ্যে সম্প্রীতির অনুভূতি প্রগাঢ় করা। তৃতীয় দিনেও একই ধরনের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। 'সাংগ্রাইং' উৎসবে রংপানি ছিটানোর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পুরোনো বছরের দুঃখ-কষ্টকে বিদায় দিয়ে নতুন বছরে কর্মস্পৃহা সৃষ্টি করা। পানি ছিটানোর খেলা ছাড়াও রাতের বেলা চলে 'সাংগ্রাইং আকা' নৃত্যগীতি। বোমাং রাজবাড়িকে কেন্দ্র করে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বলা হয়ে থাকে বোমাং রাজারা বার্মার পেগু অঞ্চলের 'তলইং'দের বংশধর। এ কারণেই 'সাংগ্রাইং আকা' নৃত্যগীতে বার্মিজ প্রভাব রয়েছে। নৃত্যগীতির শিল্পীরা পরিধান করে বার্মিজ পোশাক-আশাক। আবহ সংগীত সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত হয় বার্মিজ বাদ্যযন্ত্র।

চাকরা তাদের বর্ষবরণ উৎসকে 'সাংগ্রাইন বলে'। সাংগ্রাইন মানে আনন্দ অর্থাৎ আনন্দোৎসব। চাকরা সাংগ্রাইন উৎসব পালন করাকে পূণ্যের কাজ হিসাবে গণ্য করে। এটি তাদের সবচেয়ে বড় উৎসব। উৎসব চলে পাঁচ দিনব্যাপী। প্রতিদিনের উৎসবের পৃথক পৃথক নাম রয়েছে। প্রথম দিনের উৎসবের নাম 'পেনছোয়েত' অর্থাৎ ফুল দিবস, দ্বিতীয় দিনের উৎসবের নাম আক্তো অর্থাৎ বর্ষ বিদায়, তৃতীয় দিনের উৎসবের নাম আক্যাহ অর্থাৎ নববর্ষ বরণ, চতুর্থ দিনের উৎসবের নাম আচাদাক্ অর্থাৎ শুদ্ধ দিবস এবং শেষ দিনের উৎসবের নাম আপ্যাইন অর্থাৎ সমাপনী দিবস।

ফুল দিবসে ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে ও তরুণ-তরুণীরা দল বেধে 'কাইংকোপাইন' অর্থাৎ নকশি ফুল সংগ্রহ করতে গহীন অরণ্যে যায়। সেখান থেকে সংগ্রহ করে নকশি ফুল। এসব ফুল তারা অর্পণ করে বৌদ্ধবিহারে। চাকমা ও ত্রিপুরা উপজাতির মধ্যে ঘর সাজানোর রীতি প্রচলিত রয়েছে। চাকদের মধ্যে সেই রীতির প্রচলন নেই।

চাকরা উৎসবের দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ বর্ষ বিদায়ের দিন পিঠা, সেমাই ও মিষ্টান্ন তৈরিতে মেতে ওঠে। এদিন তারা পানি খেলাসহ অন্যান্য খেলায় মেতে ওঠে। এসব খেলার মধ্যে রয়েছে ঘিলা, কানামাছি ও লাটিম খেলা। চাকরা বর্ষ বিদায় উৎসবে দল বেঁধে বিহারে যায় এবং পূজা-অর্চনা করে। পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে তরুণরা ঢোল, ঝাঁজ ও হ্নে (এক ধরনের বাঁশি) বাজায়। তরুণীদের হাতে থাকে চন্দন পানি, দুধ ও দান সামগ্রী। তাদের অগ্রভাগে থাকে একজন বয়স্ক পুরুষ। তার হাতে থাকে 'দাইংজু' নামের একটি ঘন্টা। তিনি ঘন্টাটি বাজাতে থাকেন।

চাকরা খুব নৃত্যগীত প্রিয়। তাই বর্ষ বিদায়ের দিন গ্রামে গ্রামে অনুষ্ঠিত হয় পালাগান ও নাটক। চাকদের নাট্যানুষ্ঠানের নাম 'জাইত'। সারা রাত ধরে চলে এসব অনুষ্ঠান। তৃতীয় দিনে থাকে বর্ষবরণ উৎসব। এই দিন তারা চন্দন কাঠের পানি দিয়ে বুদ্ধকে স্নান করিয়ে নতুন বর্ষকে বরণ করে নেয়। এই দিন তারা নিজেদের ভাষায় নাচ-গান করে থাকে।

আগে চাকরা তাদের ধর্মী অনুষ্ঠান করত বর্মী ভাষায়। তবে তাদের নিজেদের ভাষায় বিয়োগান্তিক ও বিরহমূলক গান প্রচলিত ছিল। বর্তমানে চাকরা সব অনুষ্ঠানেই নিজেদের ভাষা ব্যবহার করে থাকে। 'সাংগ্রাইন' উৎসবের পরবর্তী দুটি দিনও উদযাপন করা হয় আচার-অনুষ্ঠান, মঙ্গল প্রার্থনা এবং নাট্যগীতের মাধ্যমে।

উপজাতীয় ভাষা

আদিবাসীদের জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ খুবই সীমিত। বিশ্বের বেশিরভাগ আদিবাসীর এই সমস্যা রয়েছে। এর মূল কারণ, বেশিরভাগ উপজাতি নৃ-গোষ্ঠীর নিজস্ব হরফ নেই। আবার অনেক উপজাতি নৃ-গোষ্ঠীর হরফ থাকলেও পর্যাপ্ত পাঠ্য বইয়ের অভাব রয়েছে। আগে ম্রো-উপজাতির ভাষা ছিল না। ফলে তাদের মধ্যে মাতৃভাষায় লেখা-পড়া হয়নি। পরে ম্রো উপজাতির জন্য 'ম্রচাহ চা' নামে হরফ সৃষ্টি করা হয়। খ্রিস্টান ধর্মালম্বী বম উপজাতির জন্যও রোমান হরফে প্রাথমিক অক্ষর জ্ঞান দেয়ার জন্য বই প্রকাশিত হয়। এর সমস্ত কর্মকাণ্ড সমাপ্ত করা হয় আধুনিক মুদ্রণযন্ত্রে।

চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরাদের নিজস্ব ভাষার হরফ আছে। বম উপজাতীয়দের মধ্যে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের স্বার্থে রোমান ভাষার হরফ তৈরি করা হয়েছে। ক্রামা ধর্মালম্বী ম্রোদের 'ম্রচাহ চা' নামে নিজস্ব হরফ তৈরি করা হয় বৌদ্ধ মন্দিরে আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে শিক্ষা দানের জন্য। ম্রোদের জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষার প্রচলন করা হয়েছে।

সাঁওতালী ভাষায় হরফ ছিল না। রঘুনাথ মুর্মু নামে একজন পণ্ডিত 'অলচিকি' নামক হরফ আবিষ্কার করেন। ১৯৮৩ সাল থেকে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে 'অলচিকি' হরফে মুদ্রিত গ্রন্থের মাধ্যমে সাঁওতালদের শিক্ষা দানের কাজ শুরু হয়। নাইজেরিয়ায় ২৪টি উপজাতিক প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা দান করার ব্যবস্থা রয়েছে। রাশিয়ায় ৪২টি উপজাতীয় ভাষায় শিক্ষা দানের ব্যবস্থা রয়েছে। বাংলাদেশে বান্দববানের উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট একাধিক উপজাতীয় ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা দানের পাঠ্য পুস্তক রচনা করেছে। মারমা, চাক, বোম, তঞ্চঙ্গ্যাদের স্ব স্ব ভাষায় গল্প, কবিতা ও গান সংগ্রহ করেছে। এসব কর্মকাণ্ড অবশ্যই উপজাতীয় ভাষার ইতিহাসে খুব তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

নিচে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার নাম ও অবস্থান উল্লেখ করা হলো :

ক্রমিক নং	জাতিসত্তার নাম	বাসভূমি, জেলার নাম
১.	গারো	ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, শেরপুর, নেত্রকোনা, গাজীপুর, রংপুর, সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার
২.	খিয়াং	বান্দরবান
৩.	ম্রো	বান্দরবান

৪.	বম	বান্দরবান
৫.	চাকমা	রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান
৬.	চাক	বান্দরবান, কক্সবাজার
৭.	পাংখু	বান্দরবান
৮.	লুসাই	রাঙ্গামাটি, বান্দরবান
৯.	মারমা	রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান
১০.	ত্রিপুরা	রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, সিলেট, রাজবাড়ি, চাঁদপুর, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম
১১.	তঞ্চঙ্গ্যা	রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান
১২.	রাখাইন	কক্সবাজার, বরগুনা, পটুয়াখালি
১৩.	খাসিয়া	মৌলভীবাজার, সিলেট, সুনামগঞ্জ
১৪.	মণিপুরী	মৌলভীবাজার, সিলেট
১৫.	খুমী	বান্দরবান
১৬.	হাজং	ময়মনসিংহ, শেরপুর, নেত্রকোনা, সিলেট, সুনামগঞ্জ
১৭.	বানাই	ময়মমনসিংহ, শেরপুর, জামালপুর
১৮.	কোচ	ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, শেরপুর, নেত্রকোনা, গাজীপুর
১৯.	ডালু	ময়মনসিংহ, শেরপুর, জামালপুর
২০.	সাঁওতাল	দিনাজপুর, রাজশাহী, নওগাঁ, বগুড়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রংপুর, পঞ্চগড়, নাটোর, ঠাকুরগাঁও, সিলেটের চা বাগান
২১.	মুণ্ডা	দিনাজপুর, রাজশাহী, নওগাঁ, বগুড়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রংপুর, পঞ্চগড়, নাটোর, ঠাকুরগাঁও, সিলেটের চা বাগান
২২.	পাহাড়িয়া	দিনাজপুর, রাজশাহী, নওগাঁ, বগুড়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রংপুর, পঞ্চগড়, নাটোর, ঠাকুরগাঁও, পাবনা
২৩.	মাহাতো	দিনাজপুর, রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, বগুড়া, জয়পুরহাট
২৪.	সিং	পাবনা
২৫.	খারিয়া	সিলেট
২৬.	খণ্ড	সিলেট
২৭.	আসাম (অহমিয়া)	রাঙ্গামাটি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
২৮.	গোর্খা	রাঙ্গামাটি
২৯.	কর্মকার	রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

৩০.	পাহান	রাজশাহী
৩১.	রাজুয়াড়	রাজশাহী
৩২.	মুসহর	রাজশাহী, দিনাজপুর
৩৩.	রাই	রাজশাহী, দিনাজপুর
৩৪.	বেদিয়া	সিরাজগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
৩৫.	বাগ্‌দি	কুষ্টিয়া, নাটোর
৩৬.	কোল	রাজশাহী
৩৭.	রাজবংশী	ময়মনসিংহ, গাজীপুর, রাজশাহী, দিনাজপুর, টাঙ্গাইল, খুলনা, যশোর, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, ঢাকা
৩৮.	পাত্র	সিলেট
৩৯.	মুরিয়ার	রাজশাহী, দিনাজপুর
৪০.	তুরী	রাজশাহী, দিনাজপুর
৪১.	মাহালী	রাজশাহী, দিনাজপুর, বগুড়া
৪২.	মালো	রাজশাহী, দিনাজপুর, নওগাঁ, বগুড়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রংপুর, পঞ্চগড়, নাটোর, ঠাকুরগাঁও, পাবনা
৪৩.	উরাঁও	রাজশাহী, দিনাজপুর, নওগাঁ, বগুড়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রংপুর, পঞ্চগড়, নাটোর, ঠাকুরগাঁও, পাবনা
৪৪.	ক্ষত্রিয় বর্মন	রাজশাহী, দিনাজপুর, গাজীপুর
৪৫.	রাজবংশী	ঢাকা, রাজশাহী, দিনাজপুর

সূত্র : বাংলা একাডেমী পত্রিকা, জুলাই ২০০৩-জুন ২০০৪/ ৪৭ বর্ষ ৩-৪ এবং ৪৮ বর্ষ ১-২ সংখ্যা/ জাহাঙ্গীর আলম জাহীদ

চাকমা ভাষা বাংলারই বিকৃত রূপ। এ ভাষার মধ্যে অনেক আরবী-ফার্সি শব্দের প্রচলন রয়েছে। চাকমা কবি শিবচরণ রচিত 'গোজেনের লামা' গ্রন্থ এর জ্বলন্ত উদাহরণ। চাকমা ভাষার বর্ণমালা ব্রহ্মলিপি থেকে গৃহীত। তাদের অন্যতম গ্রন্থ 'আগর তারা' চাকমা বর্ণমালায় লিখিত।

সাঁওতালী ভাষা হাজার হাজার বছরের পুরোনো। কিন্তু এ ভাষায় কোনো লিখিত বর্ণমালা পাওয়া যায়নি। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম আমেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশন সাঁওতালী ভাষায় একটি পুঁথি 'মেদিনীপুর সেরেঞ্জ' বাংলা হরফে প্রকাশ করে। ১৮৯৫ সালে বাংলা হরফে প্রকাশিত হয় সাঁওতাল ভাষায় গ্রন্থ মাঝি রামদাস টুড কর্তৃক লিখিত

'খেরওয়াল বংশ'। পরবর্তী সময়ে রোমান হরফে প্রকাশিত হয় পাউল জুঝৌর সরেন রচিত কবিতা গ্রন্থ 'বাহা ডালওয়া'।

ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিপুরা উপজাতির 'কক্‌বরক' ভাষা সরকারী ভাষার স্বীকৃতি লাভ করে। সেখানে ত্রিপুরাদের স্বীকৃত হরফ হচ্ছে বাংলা। অনেকে রোমান হরফে ত্রিপুরা ভাষা লেখেন। বাংলাদেশে যতগুলো গ্রন্থ কক্‌বরক ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে, সবগুলোই বাংলা হরফে।

অনেকগুলো উপজাতীয় ভাষায় লিখিত রূপ নেই। কথ্য ভাষায় রয়েছে ভাব প্রকাশের বলিষ্ঠ রূপ। পার্বত্য চট্টগ্রামের 'কুকি' উপজাতির কথ্য ভাষা আছে; কিন্তু হরফ নেই। কুকিরা নিজেদের ভাষার ব্যাপারে খুবই সংস্কার প্রিয়। তারা সাধারণত নিজেদের ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় কথা বলে না। অন্যদের ভাষা শেখার ব্যাপারেও তাদের অনিহা রয়েছে। কুকি ভাষায় অজস্র পুরাকাহিনী, লোকগাঁথা, উপকথা, ছড়া, গান, লোকগীতি ও প্রবাদ প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু তারা এসব সৃষ্টি সংগ্রহ করার ব্যাপারে আগ্রহী নয়। বাংলাদেশের অনেক উপজাতির মধ্যেই বাংলা ভাষা শেখার ব্যাপারে আগ্রহ রয়েছে। কিন্তু কুকিরা গোষ্ঠীগত ভাষা ছাড়া অন্য ভাষা শেখে না।

লুসাই উপজাতির বসবাস রাঙ্গামাটি ও বান্দরবানে। তাদের নিজস্ব ভাষা রয়েছে। লুসাইদের ভাষা 'লুসাই' বা 'দোলেন' নামে পরিচিত। লুসাই ভাষার বর্ণমালা ছিল না। তারা রোমান হরফকে নিজেদের বর্ণমালা হিসাবে গ্রহণ করেছে। এরপর লুসাই ভাষায় ব্যাকরণ ও অভিধান রচিত হয়েছে।

ম্রোদের মৌখিক ভাষা আছে। তারা নিজেদের ভাষা অন্যদের শেখায় না। নিজেরাও অন্যদের ভাষা শেখে না। ফলে তাদের মুখের ভাষারও বৈচিত্র্য কম। পার্বত্য চট্টগ্রামের সেন্দুজ উপজাতিরা সবচেয়ে আদিম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাদের মুখের ভাষা আদিম পর্যায়ে রয়ে গেছে। নিকটতম প্রতিবেশীরাও তাদের ভাষা বোঝে না। সেন্দুজ ভাষা কোন ভাষা থেকে উদ্ভূত তা-ও স্পষ্ট নয়। সেন্দুজরা কতকগুলো সাংকেতিক চিহ্নের মাধ্যমে নিজেদের ভাব বিনিময় করে। এই সংকেতগুলো ভাষা লিপির আদিম বৈশিষ্ট্যের ধারক। সংকেতগুলো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর কাছে পরিচিত। অন্যরা তা বোঝে না।

খাসিয়া সমাজের কোনো লিখিত ধর্মগ্রন্থ নেই। তাদের ধর্মকথা মুখে মুখে প্রচলিত। তারা সাধারণত লেখা-পড়া শেখে না। তাদের মৌখিক ভাষার সঙ্গেও অন্যান্য উপজাতীয় ভাষার মিল পরিলক্ষিত হয় না। কোনো কোনো নৃ-তত্ত্ববিদ মনে করেন, খাসিয়াদের আদি নিবাস ছিল চীনের হোয়াইকং ও ইয়াংসিকিয়াং নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে। পড়ে তারা বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। আবার কেউ মনে করেন তাদের আদি নিবাস ছিল ব্রহ্মদেশে। তারা সিলেট পার্বত্য অঞ্চলে এসেছে প্রায় পাঁচশত বছর

আগে। এখানে এসে তারা লেখা-পড়া শেখেনি। এরপর খ্রিস্টান মিশনারীদের সাহাচর্যে এসে তারা লেখা-পড়া শিখেছে। শিক্ষিত খাসিয়ারা অনেকেই খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। তাদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বেড়েছে। তবে তারা আদি সংস্কৃতিকে ত্যাগ করেনি। ড. গিয়ারসন খাসিয়া ভাষার সঙ্গে মালাক্কা ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীদের ভাষায় সঙ্গে মিল খুঁজে পেয়েছেন। খাসিয়া ভাষায় ক্রিয়া পদের পূর্বে 'ইম' যোগ করলে 'না'-বোধক অর্থ হয়। যেমন-ইম ছন ব্রিব' অর্থাৎ সেখানে কেউ নেই। বাংলা ভাষায়ও অনুরূপ নিয়ম প্রচলিত আছে। যেমন-'ন যাইমু' অর্থাৎ যাবো না। খাসিয়া ভাষার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ক্রিয়াপদের পূর্বে 'জিং যোগ করলে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যতে পরিণত হয়। যেমন-'বাম' অর্থ খাওয়া। 'জিং বাম' অর্থ হচ্ছে খাদ্য।

হাজং সমাজ ভাষার ব্যাপারে কুসংস্কারাচ্ছন্ন নয়। তারা দ্বিভাষী। হাজংরা নিজেদের মধ্যে হাজং ভাষায় কথা বললেও হাটে-বাজারে গিয়ে বাংলা ভাষায় কথা বলে। এ কারণে হাজং ভাষার মধ্যে প্রচুর পরিমাণ বাংলা শব্দ অনুপ্রবেশ করেছে। ময়মনসিংহের অন্যান্য উপজাতীয় ভাষার সঙ্গেও হাজং ভাষার মিল রয়েছে।

বাংলাদেশের বেশির ভাগ উপজাতীয় সম্প্রদায়ের ভাষার লিখিত হরফ নেই। কোনো কোনো উপজাতি বাংলা হরফ ব্যবহার করে তাদের কথ্য রূপ প্রকাশ করে। এর পাশাপাশি তারা রোমান হরফ ব্যবহারেও অভ্যস্থ। তাদের মধ্যে রোমান হরফে লেখার অভ্যাস সৃষ্টি হয়েছে খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রভাবে। এটা হয়েছে ধর্মান্তরিত হবার কারণে। তা সত্ত্বেও উপজাতিদের মধ্যে বৌদ্ধ ও হিন্দু প্রভাবই বেশি। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, চাকমারা এক সময় মুসলমান ছিল। ধীরে ধীরে তারা অন্য ধর্ম গ্রহণ করেছে।

উপজাতীয় সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে অনেকেই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তা সত্ত্বেও তাদের পূজা-পার্বণ ও আচার-অনুষ্ঠানে পশু হত্যার রীতি প্রচলিত রয়েছে। এ থেকেই বোঝা যায়, তারা নিজেদের আদিবাসী চরিত্র ত্যাগ করেনি। ভাষার ক্ষেত্রেও একই অবস্থা বিরাজমান। অনেক উপজাতীয় ভাষার আদি রূপ অক্ষুণ্ন রয়েছে। এর কারণ, তাদের অন্তর্মুখী চরিত্র। ভাষাকে ঠিকমতো লালন করতে না পারলে তার চরিত্র অক্ষুণ্ন থাকে না। ভাষা-পরিচর্যার জন্য প্রয়োজন ভাষায় লিপি নির্ধারণ, ব্যাকরণ প্রণয়ন এবং অভিধান রচনা। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আদিবাসীদের ভাষা নিয়ে তেমন কোনো পরিকল্পনা গৃহীত হয়নি।

ব্রিটিশ আমলে রাখাইন অধ্যুষিত এলাকায় অবস্থিত বার্মিজ স্কুলগুলোতে বাংলা ও ইংরেজির পাশাপাশি চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত রাখাইন ভাষা চালু ছিল। এ কারণে রাখাইনদের লিপিতে বার্মিজ লিপির প্রভাব রয়েছে। বিভিন্ন শিলালিপি, স্মৃতিস্তম্ভ ও পুঁথি পরীক্ষা করে দেখা গেছে, রাখাইনরা খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে আরাকানে রাখাইন বা ব্রাহ্মীলিপি ব্যবহার করত। ষষ্ঠ শতকের পর রাখাইনদের মধ্যে দেব-নগরী হরফ প্রচলিত ছিল। অষ্টম

শতকের দিকে ব্রাহ্মী ও দেব-নগরীর মিশ্রণে রাখাইন ভাষায় এক ধরনের নতুন বর্ণমালার সৃষ্টি হয়েছে, যা রাখাইন বর্ণমালা হিসাবে পরিচিত।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্ব দক্ষিণে চাক উপজাতির বসবাস। তারা মঙ্গোলীয় নৃ-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। অনুমান করা হয় চাক ভাষার বর্ণমালা ছিল। কিন্তু লিখিত গ্রন্থের অভাবে তা কালের গর্ভে হারিয়ে গিয়েছে। চাকদের মধ্যে অনেকে বাংলা ভাষায় কথা বলেন। এ জন্য চাকভাষায় অনেক বাংলা শব্দ প্রবেশ করেছে।

আদিবাসীরা নিজেদের ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রক্ষার ব্যাপারে এতই অদম্য যে অনেক চাপের মুখেও তারা অন্যের ভাষা ধর্ম ও সংস্কৃতির কাছে নতি স্বীকার করে না। তারা যুগ যুগ ধরে বাঙালিদের সঙ্গে বসবাস করেও নিজেদের ভাষাকে বিসর্জন দেয়নি। তারা সনাতন জীবন, পোশাক, খাদ্য এবং বাসগৃহ নির্বাচনেও সংরক্ষণশীল। এমনকি একাধিক আদিবাসী একই পরিবেশে বসবাস করেও কেউ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দেয়নি। একটি ক্ষুদ্র জাতিসত্তা আরেকটি ক্ষুদ্র জাতি সত্তা দ্বারা প্রভাবিত হয়নি।

মণিপুরী নৃত্য

আদিবাসী মণিপুরীদের জীবনধারার মধ্যে রয়েছে শিল্পচেতনার এক মৌলিক দর্শন। আর তারা তা ফুটিয়ে তোলে নৃত্যের মাধ্যমে। তাই তাদের নাচ দেখে মনে হয় সুরের মাধুর্যে বয়ন করা জোছনা রাতের স্নিগ্ধ পরশ। মণিপুরী ভাষায় আসামী ও বাংলা ভাষার প্রভাব রয়েছে। ইতিহাসে যোদ্ধা জাতি হিসাবে মণিপুরীদের পরিচয় রয়েছে।

মণিপুর ও বার্মার মধ্যে বেশ কয়েক বার যুদ্ধ হয়। এ ছাড়া ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মণিপুরে প্রবেশ করে নির্মম নির্যাতন চালায়। মণিপুরীরা বার্মার সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বাংলাদেশ ও ভারতে প্রবেশ করে। তখন থেকেই তারা বাংলাদেশের সিলেট জেলার সমতল ভূমি মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সিলেট ও সুনামগঞ্জে বসবাস শুরু করে। এ ছাড়া তাদের আবাসভূমি রয়েছে ভারতের মণিপুর, আসাম, ত্রিপুরা ও আগরতলায় এবং বার্মার বিভিন্ন অঞ্চলে।

মণিপুরীদের মধ্যে রয়েছে মূলত দুটি গোত্র-বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ও মৈতৈ মণিপুরী। তাদের মধ্যে শতকরা সত্তর ভাগই বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী। বাকি শতকরা ত্রিশ ভাগ মৈতৈ মণিপুরী। মণিপুরীদের মধ্যে দুটি ভাষা প্রচলিত রয়েছে-বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষা ও মৈতৈ ভাষা। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীদের ভাষার উৎপত্তি হয়েছে মাগধী প্রাকৃত ও মাগধী অপংভ্রের প্রাচ্য শাখা থেকে। ফলে তাদের ভাষার গঠন শৈলীর মধ্যে আসাম, উড়িষ্যা ও বাংলা ভাষার প্রভাব রয়েছে। মৈতৈ মণিপুরী ভাষার উৎস হচ্ছে ব্রাহ্মী ভাষা। মণিপুরী ভাষার নিজস্ব বর্ণলিপি রয়েছে। তবে তারা মণিপুরী ও বাংলা উভয় বর্ণমালাতে গ্রন্থ রচনা করে। তাদের মধ্যে বাংলা ভাষার চর্চা অধিকতর।

মণিপুরীদের সবচেয়ে জনপ্রিয় উৎসব হচ্ছে রাস উৎসব। অন্যান্য জনপ্রিয় উৎসবের মধ্যে রয়েছে রথযাত্রা, পৌষ সংক্রান্তি, দোলযাত্রা, চৈত্র সংক্রান্তি, গুণসিনা ইত্যাদি। মণিপুরীদের সমাজ ক্ষত্রিয় শাসিত। তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ব্রাহ্মণ। তাদের গ্রামভিত্তিক মন্দিরে রয়েছে রাধা-কৃষ্ণ, লক্ষ্মী-স্বরস্বতী, শিব, বিষ্ণু ও গৌরাঙ্গের মূর্তি। এ ছাড়া তারা পৌরাণিক রীতিতে অন্যান্য পূজার আয়োজন করে।

মণিপুরীদের ঘরবাড়িতে থাকে ছনের ছাউনি এবং বাঁশের বেড়া। তারা নিসর্গ প্রিয়। তাদের ভিটে বাড়ির আঙিনায় থাকে বিভিন্ন ফল, ফুল ও শোভাবর্ধক গাছ। এসব গাছের মধ্যে রয়েছে আম, জাম, কাঁঠাল, বেল ও তেতুল গাছ। বাঁশঝাড়ও থাকে বাড়ির পাশে।

তারা গৃহপালিত পশু ছাড়াও ময়না, টিয়া, কালো চড়ুই ও কবুতর পোষে। কিন্তু তারা পোষা পাখি আহার করে না। তারা জলাশয়ের তীরে বসবাস করতে পছন্দ করে।

মণিপুরী সমাজ অত্যন্ত উঁচু মানের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অধিকারী। নৃত্যগীত ছাড়া তাদের জীবন কল্পনা করা যায় না। তাদের পূজা-পার্বণ, আচার-অনুষ্ঠান, জন্ম-বিয়েসহ যাবতীয় উৎসবের অপরিহার্য অঙ্গ হচ্ছে নৃত্যগীত।

মণিপুরীদের নৃত্যের রয়েছে দুটি ঘরাণা-(১) বিষ্ণুপ্রিয় ও (২) মৈতৈ। তাদের মধ্যে ভাষার পার্থক্যের কারণেই দুটি ঘরাণার সৃষ্টি হয়েছে। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীরা মৈতৈদের আদি মণিপুরী হিসাবে স্বীকার করে না। তাদের মতে, নবদ্বীপের শান্তদাস গোস্বামী রামানন্দী ধর্ম প্রচারের সময় বাঁধা প্রাপ্ত হন। এরপর তিনি আগুন ও তেলের স্পর্শে নোংখাং দিঘিতে ডুব দিয়ে আত্মশুদ্ধি করে মণিপুরী ধর্মে দীক্ষিত হন। মৈ অর্থ আগুন এবং তৈ অর্থ তেল। তা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে মৈতৈ মণিপুরী সম্প্রদায়ের নামের তত্ত্ব। তারা সূর্যের উপাসক। ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন, মণিপুরী মৈতৈরা বিরাট কিরাত জাতির ভোট-ব্রহ্ম শাখার অন্তর্গত কুকি প্রশাখার উপজাতি।

মণিপুরীরা পোশাকে-আশাকে মার্জিত। তারা নিজেদের পোশাক নিজেরাই তৈরী করে। মহিলারা বুক আবৃত করে পরিধান করে লাহিং এবং ব্লাউজ। লাহিং হচ্ছে এক ধরনের ঘাগড়া। এ ছাড়া তারা ওড়না ব্যবহার করে। তাদের মধ্যে শাড়ি ব্যবহারের রীতিও প্রচলিত রয়েছে। অবিবাহিত মহিলারা কপালে টিপ পড়ে। বিবাহিত মহিলারা সিঁথিতে সিঁদুর লাগায়। মণিপুরী পুরুষরা পরিধান করে পাহাতি, ধুতি, পাঞ্জাবি প্রভৃতি।

একসময় তাদের মধ্যে ব্রাত্য ধর্ম প্রচলিত ছিল। পরবর্তী সময় তারা বিষ্ণুর অনুসারী হওয়ায় আর্য ধর্মে দীক্ষিত হয়। তাদের বিখ্যাত নৃত্যের মধ্যে রয়েছে মণিপুরী নৃত্য, চিত্রাঙ্গদা, লীলা বিলাস, খাম্বা থৈরী, লাইহারউবা ইত্যাদি।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে বরীন্দ্রনাথ সিলেটে যান এবং মণিপুরীদের রাসনৃত্য দেখে মুগ্ধ হন। হিন্দু পুরাণে উল্লেখ রয়েছে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন পর্যটনে বের হয়ে মণিপুরে যান এবং রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদাকে বিয়ে করেন। এ কারণেই বলা যায়, মণিপুরীরা একটি প্রাচীন জাতি। তাদের নাচের মধ্যে রাসলীলাই প্রধান। ১৭৮৯ সালের অগ্রায়ণ মাসে শুক্লা একাদশী তিথিতে মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র প্রথম রাসনৃত্য আরম্ভ করেন। মণিপুরীদের মধ্যে যারা রাসনৃত্যে অংশ নেন, তাদেরকে আগের দিন উপোস থাকতে হয়। তাদের উপবাস ক্লিষ্ট দেহে কোনো ক্লান্তির ছাপ পড়ে না। তারা নিজেরা ভগবানের করুণা লাভের জন্য নৃত্য করেন। এ জন্য তাদের মনে থাকে প্রশান্তি। রাসনৃত্য অনেকটা প্রশান্ত। রাসনৃত্যে মাথায় চূড়ার আকারে ভূষণ পরানো হয়। অথবা চুলগুলো চূড়া করে বেঁধে দেয়া হয়। রাসনৃত্যে মুখের উপর ব্যবহৃত সূক্ষ্ম ওড়নাকে বলে মইখুম। এই নৃত্যে ব্যবহৃত ঘাগড়াকে বলা হয় 'কুমিন'। ঘাগড়ার উপর আরেকটি স্বচ্ছ ঘাগড়া থাকে। তাকে বলা

হয় 'পোশওয়ান'। ছেলেদের কোমর বন্ধনীকে বলা হয় 'খন্নপ'। রাসনৃত্যে মেয়েরা সিঁথিতে সিঁদুর পরে। সিঁথির সাথে ঝুলানো থাকে কারুকাজ খচিত জরি। একে বলা হয় চুবারৈ।

বিষ্ণুপ্রিয়া ও মৈতৈ মণিপুরীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক সংহতি রয়েছে। তবে দুই গোত্রের ভাষা দুই রকম। এক গোত্রের ভাষা অন্য গোত্র বোঝে। মণিপুরীরা রাসনৃত্যের মধ্যে নিজেদের সৃষ্টির রহস্য সন্ধানের তাগিদ অনুভব করে। রাসনৃত্যের মধ্যে প্রেমের রসই মূর্ত হয়ে ওঠে বার বার। শিবও রাসনৃত্যের প্রতি আসক্ত হন। তিনি নিজে একটি রাসনৃত্য করার জন্য আসামের উত্তর পূর্বাঞ্চলের হিমালয়ের পাদদেশে কুমার পর্বতে উপস্থিত হন। অন্ধকারাচ্ছন্ন পর্বতের পাদদেশকে নৃত্য উপযোগী করার জন্য সৃষ্টিকর্তা সব কিছুই করেন। অনন্ত নাগ সমস্ত স্থানটিকে তার মণির আলোয় আলোকিত করে তোলেন। প্রতিটি ধর্মেই বিশ্ব সৃষ্টির সঙ্গে পানি ও আলোর সম্পর্ক রয়েছে। মণিপুরী রাজ্য সৃষ্টির মূলেও তা ছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাসনৃত্য। কাজেই নাচ থেকে মণিপুরীদের বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

মধ্যযুগে বাংলা ভাষায় রাধা-কৃষ্ণকে নিয়ে অসংখ্য গীতি কবিতা রচিত হয়েছে। সেগুলো রচিত হয়েছে গাওয়ার জন্যই। কালের বিচারে গানগুলো কালোত্তীর্ণ হয়েছে। মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের মধ্যে ভাষার ব্যবধান সৃষ্টি করেছে মানসিক দূরত্ব। কিন্তু লোকসংগীত ও মরমিয়া সংগীতের মধ্যে প্রবেশ করেছে গানগুলোর সুর। রাসনৃত্যের মুদ্রাগুলো কালজয়ী হয়েছে। মানুষের হাসিতে যেমন অনুবাদ না করেই বোঝা যায় তার অর্থ, ঠিক তেমনি নাচের মুদ্রাগুলো অন্য ভাষায় রূপান্তর না করেই নৃত্যের অর্থ বোঝা যায়। এ কারণেই মণিপুরী নৃত্যের বিষয় ও ভঙ্গি কালজয়ী হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে রাধা ও গোপীবৃন্দের সঙ্গে প্রেমলীলায় মত্ত হতেন। এ কারণে রাসনৃত্যের মূল সুরই হচ্ছে প্রেমরস আস্বাদন। রাসনৃত্যের মূল বিষয়বস্তু গড়ে উঠেছে রাধা-কৃষ্ণের পূর্ব রাগ, রাগ, অনুরাগ, অভিসার ও প্রেম লীলাকে কেন্দ্র করে। এসব নৃত্যে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস প্রমুখ বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী গীত হয়। কৃষ্ণভক্ত মণিপুরীরা রাসনৃত্যের ভঙ্গীও মুদ্রা তন্ময় হয়ে উপভোগ করেন।

মণিপুরী সমাজে বেশ কয়েক প্রকার রাসনৃত্য প্রচলিত রয়েছে। এসব নৃত্যের মধ্যে রয়েছে মহারাস, বসন্তরাস, নিত্যরাস এবং কৃষ্ণের প্রেমলীলার বিচিত্র প্রকাশ।

মণিপুরীরা কার্তিক মাসের পূর্ণিমা রাতে মহারাসের আয়োজন করে। এ সময় তাদের মধ্যে সাজ সাজ রব পড়ে যায়। বসন্তরাস চৈত্র মাসের পূর্ণিমায়, কৃষ্ণরাস আশ্বিনের অষ্টম দিবসে, গোপরাস কার্তিক মাসের মাঝামাঝি সময়ে এবং নৃত্যরাস যে কোনো উৎসবে অনুষ্ঠিত হয়। মণিপুরীরা তাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে রাসনৃত্য

পরিবেশন করে। রাসনৃত্যে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে রয়েছে পাখোয়াজ, খঞ্জনি, মন্দিরা, ঢোলক, খোল, সেমবুং, বাঁশি, তানপুরা, এস্রাজ, ময়বুং, হারাপু, জনা ইত্যাদি।

মণিপুরীরা বিশ্বাস করে যে পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে রয়েছে নৃত্যের অবদান। নৃত্য পবিত্র। নৃত্য সৃষ্টির সারবস্তু। মণিপুরী নৃত্যের মধ্যে অন্যতম প্রধান নৃত্য হচ্ছে 'লাইহারাউবা'। 'লাই' অর্থ দেবতা। হারাউব অর্থ আনন্দ-নৃত্য। দেবতাদের তুষ্টি সাধনের জন্য এই নৃত্য পরিবেশন করা হয়। এতে রয়েছে 'মৈতৈ' নৃত্যধারার বৈশিষ্ট্য। 'লাইহারাউবা' নৃত্যে অংশ নেয় 'মউবা' ও মউবী সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়কে বাংলা ভাষায় বলা হয় দেবদাস–দেবদাসী সম্প্রদায়। দেবকথা বর্ণনা করাই তাদের কাজ। তাদের জীবন শিব ও পার্বতীর আরাধনায় উৎসর্গীত।

মহাভারতে মণিপুরের নাম মেকলি দেশ হিসাবে উল্লেখ আছে। আসামের প্রাচীন দলিলপত্রে মণিপুরের নাম মুখলাই বা মুখল নামে পরিচিত। মণিপুরে একটি প্রবাদ প্রচলিত রয়েছে মণিপুরীদের পূর্বপুরুষরা 'যমরাজ্য' থেকে আগমন করেন। প্রাচীনকালে মণিপুরে এক দুর্ধর্ষ জাতি বাস করত। তারা আগুন ও লোহার ব্যবহার জানত না। কাচা মাংস খেয়ে জীবন ধারণ করত। 'পৈরেইতন' নামে একজন দলপতি তার সৈন্য-সামন্ত নিয়ে যমরাজ্য থেকে গিয়ে মণিপুরে রাজ্য স্থাপন করেন। তারা আগুন ও লোহার ব্যবহার জানত। এমনকি তাদের মধ্যে গান-বাজনারও প্রচলন ছিল। অনেকের ধারণা পৈরেইতনের বংশধররাই 'মৈতৈ' নামে পরিচিত। নৃ-বিজ্ঞানীদের মধ্যে এমনও ধারণা প্রচলিত রয়েছে মণিপুরীরা আসামের 'কুকি' জাতির অন্তর্ভুক্ত। কারণ কুকি ও মণিপুরীদের মধ্যে বংশোদ্ভব সম্পর্কে একই ধরনের পুরাকাহিনী প্রচলিত রয়েছে। কাহিনীটি এই রকম–

সর্প-পুরুষ 'পাখাংবা' ছিলেন মণিপুরীদের পূর্বপুরুষ। একবার তিনি অরণ্যের অভ্যন্তরে বিরাট গর্ত থেকে বেরিয়ে আসেন। তিনি একজন তরুণের বেশ ধরে জুম কর্মরতা একজন মহিলাকে আকৃষ্ট করেন। তাকে বিয়ে করে ঘরে নেন। সেখান থেকে মণিপুরী জাতির সৃষ্টি। এ কারণে তারা সর্পকে সম্মান করে। ভোগ দেয়। মণিপুরীদের রাজা অভিষেকের সময় কাষ্ঠ নির্মিত সর্পের মাথায় উপবেশন করেন। ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে মণিপুররাজ নাগাপর্বত দখল করেন এবং এই স্মৃতি অক্ষুণ্ন রাখার জন্য তিনি একটি স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণ করেন। এই স্মৃতিস্তম্ভে অঙ্কিত রয়েছে একটি সর্পের নকশা।

মণিপুরী সমাজে প্রচলিত রয়েছে অসংখ্যা পুরাকাহিনী, লোককাহিনী, প্রবাদ, প্রবচন, লোকগীতি ও উপকথা। তাদের লোকগীতিতে রয়েছে অপরূপ পাহাড়ি নিসর্গ, ফুল ও পাখির বর্ণনা। রাধার রূপ-যৌবন ও শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব লাবণ্যের বর্ণনা রয়েছে মণিপুরী গানে। দেহ ও মনের লীলায়িত ভঙ্গীতে পুষ্পিত হয়ে ওঠে তাদের নৃত্যগীত।